Starts → 7:10 PM

৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

Good Evening

লেকচার-০৫

টপিক:

- ✓ **আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ:** বড় অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা (১৯৭১-২০২৫), বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি।
- ✓ **সমস্যা সমাধান:** দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, Land Boundary, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি।

Important

Part-C → Problem Solving

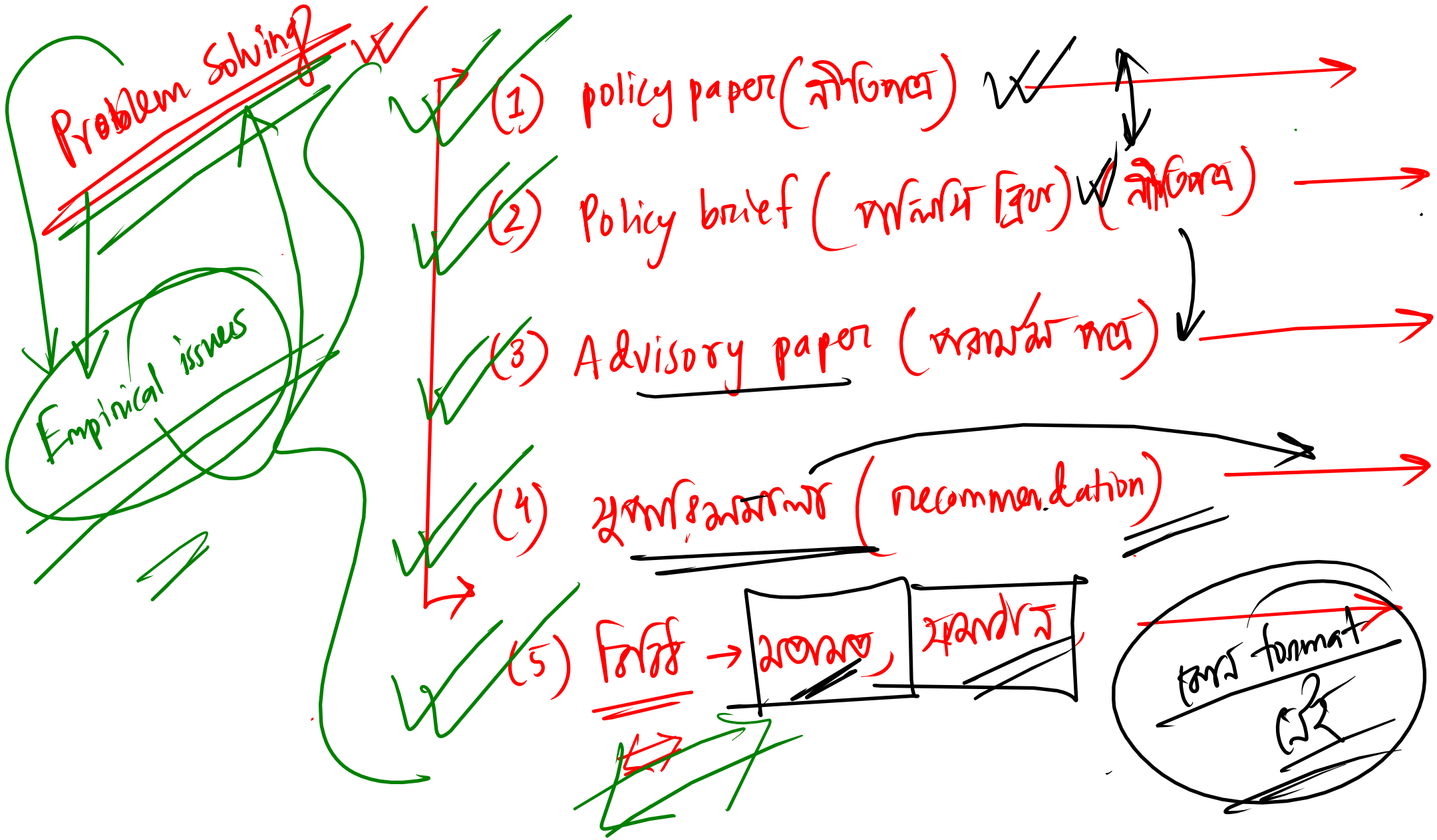

Problem solving

Empirical issues

(1) policy paper ([illegible])

(2) Policy brief ([illegible]) ([illegible])

(3) Advisory paper ([illegible])

(4) [illegible] (recommendation)

(5) [illegible] → [illegible], [illegible]

[illegible] format

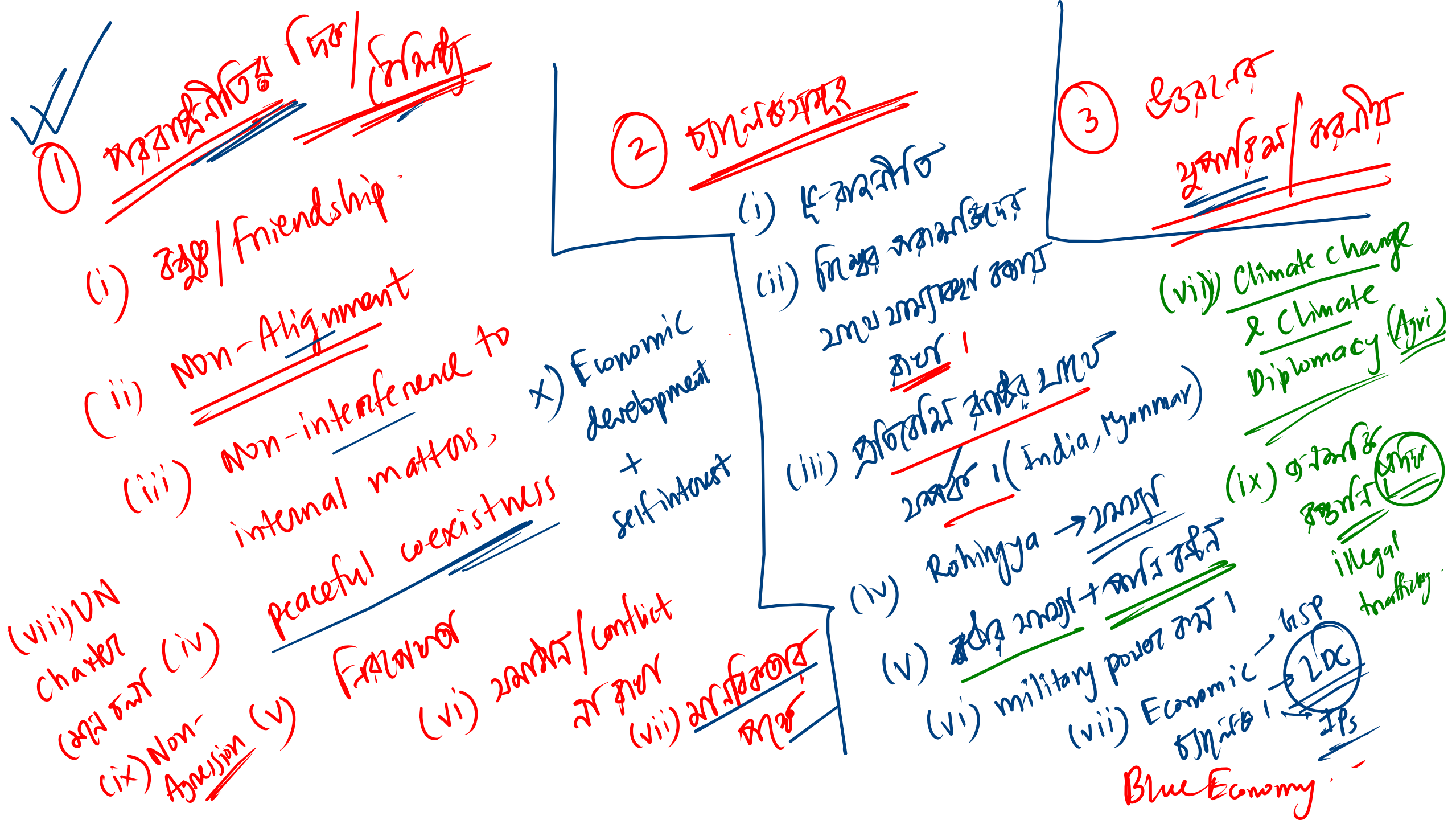

① পররাষ্ট্রনীতির দিক/নির্দেশ

(i) বন্ধুত্ব/Friendship

(ii) Non-Alignment

(iii) Non-interference to internal matters,

(iv) peaceful coexistence

(v) নিরস্ত্রীকরণ

(vi) বিরোধ/conflict না করা

(vii) মানবিকতার পাশে

(viii) UN Charter মেনে চলা

(ix) Non-Aggression

x) Economic development + selfinterest

② চ্যালেঞ্জসমূহ

(i) ভূ-রাজনীতি

(ii) বিশ্বের পরাশক্তিদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

(iii) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপ রয়েছে। (India, Myanmar)

(iv) Rohingya → সমস্যা

(v) সীমান্ত সমস্যা + সমুদ্রসীমা

(vi) military power কম।

(vii) Economic চ্যালেঞ্জ। → GSP, LDC, IPs

(viii) Climate change & Climate Diplomacy (Agri)

(ix) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস (মাদক) illegal trafficking

Blue Economy

③ উত্তরণের সুপারিশ/করণীয়

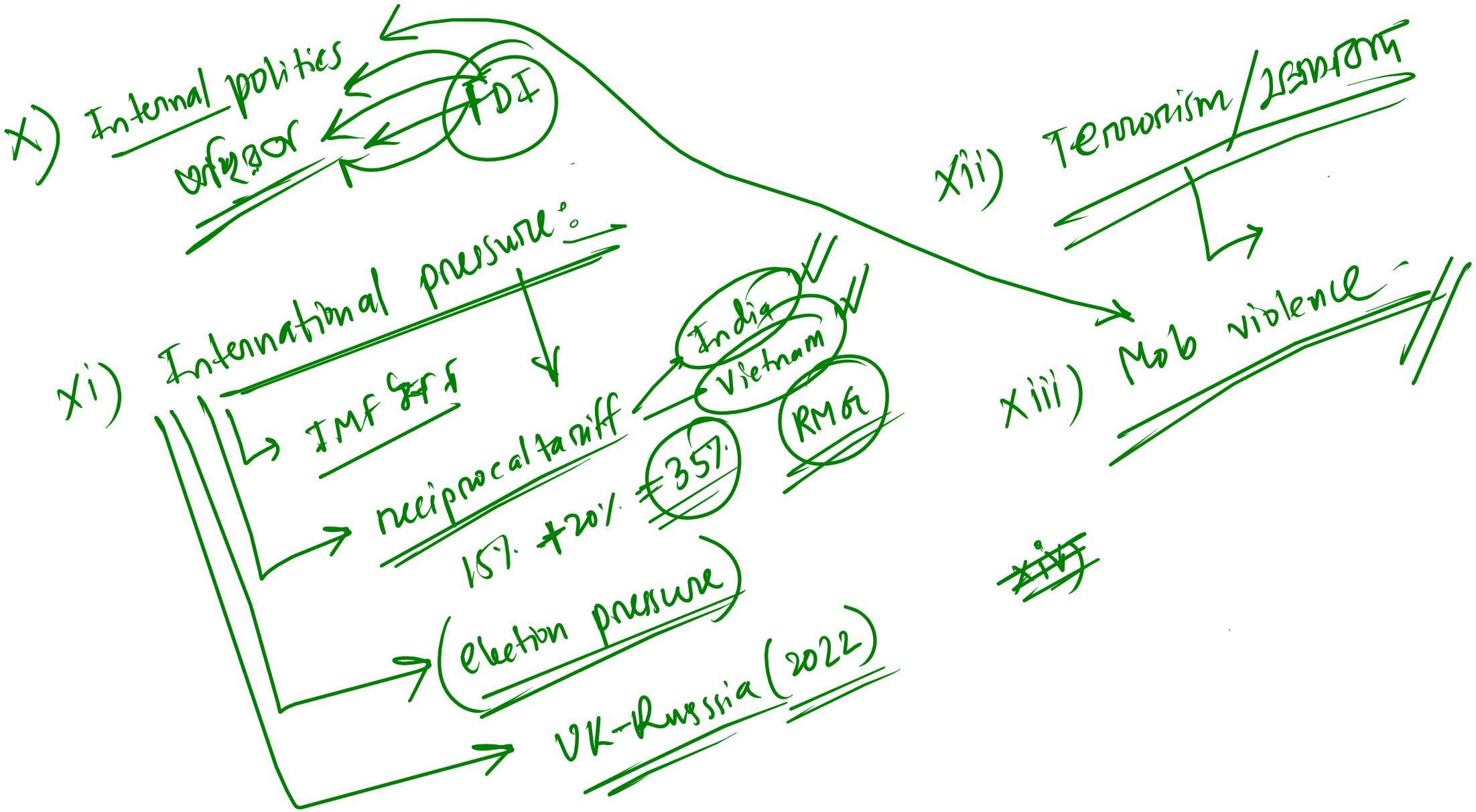

x) Internal politics
অস্থিরতা
FDI

xi) International pressure:
- IMF চাপ
- reciprocal tariff
  - 15% + 20% = 35%
  - India
  - Vietnam
  - RMG
- election pressure
- UK-Russia (2022)

xii) Terrorism / জঙ্গিবাদ

xiii) Mob violence

~~xiv)~~

সরকারের করণীয় / সুপারিশমালা

(i) Democratic government establishment → FDI, image, Economy

(ii) প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নত করা

(iii) Hydro-Diplomacy apply করা।

(iv) Climate নিয়ে সোচ্চার ভূমিকা

(v) International cooperation চাওয়া rohingya repatriation-এ

(vi) warm relation with international organization

বাংলাদেশের বড় অর্জন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী একটি বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবকাঠামো বিনির্মাণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এবং সরকার প্রধানদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। যদিও যে মাত্রায় উন্নয়ন কাম্য ছিল সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হয়নি। তারপরও বিদেশি শাসক শ্রেণির নির্যাতন নিপীড়নে বিধ্বস্ত এ দেশ আজ যে পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটিও কম নয়। কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দেশিয় কাজেই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যে লড়াই করে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের দেশের নাম বিশ্ব মানচিত্রে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল করেছে।

❖ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ

দেশিয় গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও নানাবিধ সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব এবং নেতৃত্বও দিচ্ছে। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো :

➢ **উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রবেশ :** জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে এলডিসি ক্যাটাগরি চালু করে। জাতিসংঘের এলডিসি তালিকাভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের শর্ত হলো ৩টি। যথা

ক. মানব সম্পদ সূচক (৬৬ বা এর বেশি পয়েন্ট);

খ. মাথাপিছু আয় সূচক (১২৩০ মার্কিন ডলার বা এর বেশি অর্জন);

গ. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (৩২ শতাংশের নিচে থাকা)।

বাংলাদেশ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। ১ জুলাই, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করে। ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার জন্য জাতিসংঘের এলডিসি ক্যাটাগরির ৩টি শর্ত অর্জন করে (মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৭২.৮ পয়েন্ট, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৪.৮ পয়েন্ট আর মাথাপিছু আয় সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ১২৭২ মার্কিন ডলার)।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তার ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে শর্ত ছিল এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে সূচকের একই ধারা বজায় রাখতে হবে ২০২১ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশ ২০২১ সালে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে চূড়ান্ত উত্তরণের সুপারিশ দেয় সিডিপি।
- একই ধারা বজায় থাকলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার কথা। তবে করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশ বাড়তি অরও দুই বছর সময় পায়। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হলেও নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ৩ বছর পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।
- উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে জিএসপি সুবিধা পায় তা ২০২৯ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরবর্তীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

➤ **যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :** বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় অর্জন জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু করা। ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে ১৯ নং আইন দ্বারা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) গঠন করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২৫ মার্চ, ২০১০ এবং দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২২ মার্চ, ২০১২। চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ৬ জনের। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট রায় প্রদান করেছে ৪১টি। যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর সক্ষমতা ও আইন ব্যবস্থার উন্নয়ন তুলে ধরতে সক্ষম হলো।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

> **সমুদ্র বিজয় :** গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেখানেই কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের বিরোধ ছিল দুই দেশের সঙ্গে (ভারত ও মিয়ানমার)। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র সীমা বিরোধ মামলার রায় জয় ১৪ মার্চ, ২০১২ সালে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে রায় দেয় জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea)। এই রায়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে ১,১১,০০০ বর্গ কি. মি.।

বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় ৭ জুলাই, ২০১৪ সালে। বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি মামলার রায় দেয় নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত PCA (Permanent Court of Arbitration)। এই রায়ে বাংলাদেশ-ভারত বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কি. মি. আর ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.। তবে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টী পায় ভারত। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দৈর্ঘ্য ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.।

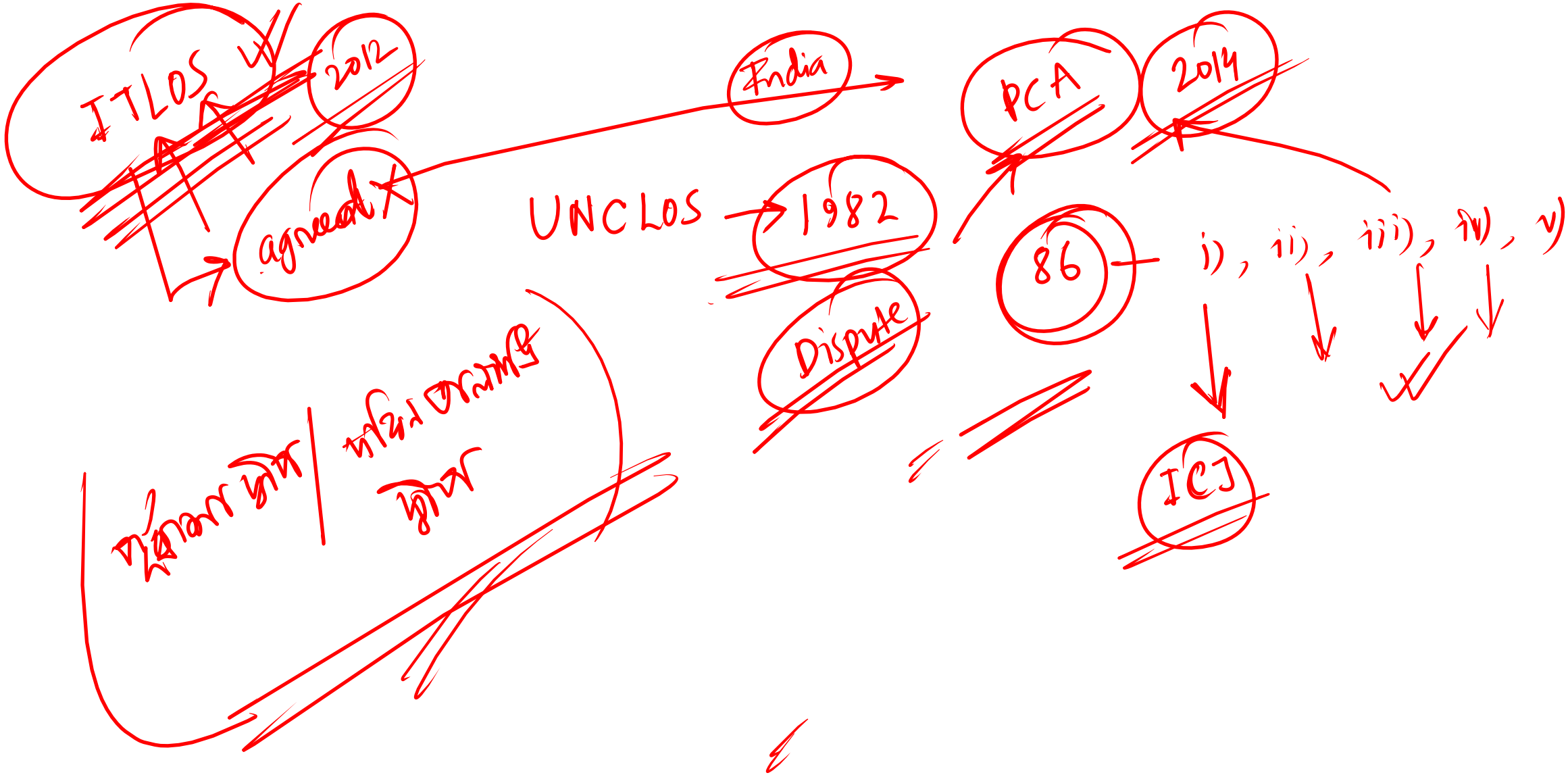
ITLOS
2012
agreed
India
PCA
2014
UNCLOS
1982
Dispute
86
i), ii), iii), iv), v)
ICJ

বাংলাদেশের বড় অর্জন

➢ **ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করবে এবং ভারত বিনিময়ে বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর ছেড়ে দেবে। বাংলাদেশ সরকার ২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী দ্বারা তা স্বীকৃতি দিলেও ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। আর এই সমস্যার সমাধান হয় ১ আগস্ট, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১টি আর ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১টি। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশ ১৭,০০০ একর জমি লাভ করে আর ভারত পায় ৭,৫০০ একর জমি। বর্তমানে ৬.৫ কি, মি. জমির সীমানা এখনো অচিহ্নিত রয়েছে। ছিটমহল বিনিময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটি অর্জনও বলা যায়।

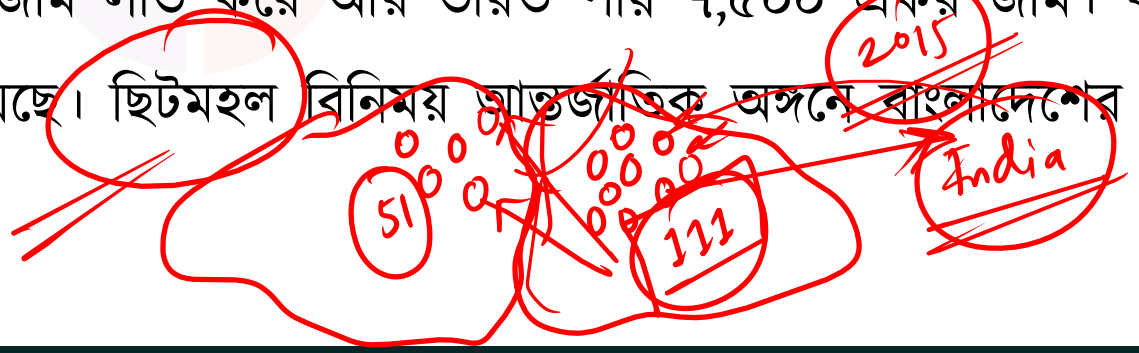

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ :** বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে। ৪১তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'নবযাত্রা' ও 'জয়যাত্রা' নামে দুইটি মিং ক্লাস সাবমেরিন নৌবাহিনীতে যুক্ত করার মধ্যদিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হয়। তবে বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক SEA ME-WE-4 এ যুক্ত হয় ২১ মে, ২০০৬ সালে। বাংলাদেশে SEA-ME-WE-4 এর ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে কক্সবাজারের ঝিলংমে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এ যুক্ত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে। দ্বিতীয় সাবমেরিন এর দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কি.মি. এবং এর ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়। সাবমেরিন যুগে প্রবেশের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ নতুন মাত্রা যোগ করলো।
- **MDG (Millennium Development Goals) অর্জনে সাফল্য :** ২০০০ সালে ঘোষিত MDG তে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৮টি উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য দেশ একমত হয়। MDG গৃহীত হয় ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০; মেয়াদকাল ছিল ২০০১ থেকে ২০১৫। তাই মেয়াদকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। এটি জাতিসংঘের ৫৫তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। লক্ষ্যগুলো অর্জনে ইতোমধ্যে ৯টি সূচক অর্জন করেছে বাংলাদেশ আরও ১০টি সূচকে অর্জন লক্ষ্য মাত্রার কাছাকাছি অবস্থান করছে। MDG অর্জনে সাফল্য লাভের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- দারিদ্র্যের ব্যবধান অনুপাত ২০১৫ সালে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তারপূর্বেই বাংলাদেশ তা ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

- শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য এমডিজি-৪ অর্জনে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশকে ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রার MDG-২ এর ক্ষেত্রে ২০১১ সালের মধ্যেই ৯৫ শতাংশ শিশুকে প্রাইমারী স্কুলে পাঠানোর লক্ষ্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

- বাংলাদেশ মানব সূচক উন্নয়নে ০.৫২৪ সূচক অর্জন করে ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম স্থান অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির রোল মডেল। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মান উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করায় আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন, সাউথ সাউথ নিউজ ও জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে **সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড** প্রদান করে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

➢ **জাতিসংঘে বাংলাদেশ :** ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে জাতিসংঘের (২৯তম সাধারণ অধিবেশনে) সদস্য পদ লাভ করে। ড. মুহাম্মদ ইউনুস জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৮৬ সালে (৪১তম অধিবেশনে)। এই অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে ২ বার। ১ম বার নির্বাচিত হয় ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ সালে (১৯৭৯-১৯৮০ মেয়াদে) এবং ২য় বার নির্বাচিত হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে (২০০০-২০০১ মেয়াদে)। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদ লাভ করে ২০০১ সালে। এই মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (এস এ করিম) এবং বর্তমানে স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন রাবাব ফাতেমা (১৪তম স্থায়ী প্রতিনিধি, দ্বিতীয় নারী প্রতিনিধি)। জাতিসংঘে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন আমিরাহ হক এবং প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্থায়ী সালিশি আদালতের বিচারক হন বিচারপতি মোঃ তফাজ্জল ইসলাম ও বিচারপতি আওলাদ আলী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ০.০১ শতাংশ।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

➢ **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ :** ১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষণ গ্রুপ (UNIIMOG) অপারেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশ নেয়। জাতিসংঘ শান্তিমিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কর্মরত আছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তি মিশনে (UNTAG) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম অংশ নেয়। ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় শহিদ হন। শেরে বাংলানগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিহতদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এসপি মিলি বিশ্বাস প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মোট ৪৩টি দেশে ৬৩টি শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ১০টি দেশে ১০টি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ৫৮১৮ জন সশস্ত্র বাহিনী কর্মরত আছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। শান্তিরক্ষা মিশন এখন বাংলাদেশের জাতীয় কূটনীতি ও আয়ের অংশ।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদেরকে বহির্বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়। ফলে আমাদের যত অর্জন ঠিক তেমনি তত বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হলো :

- করোনা ও অর্থনীতি
- করোনা ও জনশক্তি রপ্তানি
- বেকারত্ব
- LDC উন্নয়ন
- Blue Economy
- অভিন্ন নদীর পানিবন্টন
- মিয়ানমার ইস্যু
- অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িক অস্থিতিশীলতা
- রপ্তানি আয় কাঙ্ক্ষিত হারে না বাড়া
- রিজার্ভ কমে যাওয়া
- রেমিটেন্স ও হুন্ডি

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। তাই এ দেশকে অবজ্ঞা করে বিশ্ব সম্প্রদায়ও ভালোভাবে চলতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বদরবার থেকে আমরা যদি আমাদের স্বার্থ আদায় করতে না পারি তবে আমাদের দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ:

- করোনা মহামারি মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ। আর তাই টিকা প্রাপ্তি এখন একমাত্র পন্থা। কীভাবে বিভিন্ন দেশ হতে টিকা আমদানি করা যায় এবং দেশে কীভাবে টিকা উৎপাদন করা সম্ভব এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য।
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলায় জয় লাভের ফলে বাংলাদেশ এখন ব্যাপক সমুদ্র অঞ্চলের মালিক। ফলে সুনীল অর্থনীতি তথা সমুদ্র অর্থনীতির দুয়ার খুলে গেছে। এই বিশাল সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সম্পদ আহরণে কীভাবে দক্ষতা বাড়ানো যায় সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে সম্ভব হবে। তাই সমুদ্র অর্থনীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা

- বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের দেশও বলা হয়েছে। এদেশে তেল-গ্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার উপযোগী করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের জন্য ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটা একটা বৃহত্তম প্রকল্প, তাই প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সচল থাকতে পারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা যাতে এই প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সেই উদ্দেশ্য ও ভাবনাকে মাথায় রেখে অগ্রসর হতে হবে।
- বাংলাদেশ-ভারত তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে অনেক নাটক হয়ে গেল, কিন্তু কোনো সুরাহা মিললো না। তাই বাংলাদেশ চীনের সহযোগিতায় তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে আসবে ভারত। তাই এই পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কী ধরনের বাঁধা আসতে পারে তা আগেই পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা

- বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলের দেশ হওয়ায়, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার দেশে পরিণত হচ্ছে। তাই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী ধরনের পরিকল্পন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর দেওয়া ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যৎ চীন-ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ বলা হয় রেমিট্যান্সকে। আর এই রেমিট্যান্স প্রবাহ সচল রাখতে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানিতে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। তাই জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে আরো বেশি তৎপর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের তিন পাশে ভারত অবস্থিত হলেও তারাও নানাভাবে আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কারণ ভারতের চতুর্দিকে রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চীন, মিয়ানমার। ফলে আমরা যদি অন্য রাষ্ট্রগুলোর মতো ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠি তা কারোর জন্যই ভালো হবে না। তাই ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে আমাদের স্বার্থগুলো বুঝে নিতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা

- বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি ভয়ানক শব্দ। তাই কোনো জঙ্গিবাদী সংগঠন যেন আমাদের দেশে শাখা-উপশাখার মতো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।
- সমুদ্রসীমা যেমন আমরা আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করেছি তেমনি অন্যান্য যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে সেগুলোও আমাদের আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করে আনতে হবে।
- প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আমাদের দেশের নিরাপত্তা, শান্তি যেন বিঘ্ন ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থেকে ভবিষ্যতে যেন কোনো অপশক্তি বাংলাদেশে আঘাত হেনে এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ দেশের ভাবমূর্তি যেন বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল হয় সে ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বদরবার যদি বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মূল্যায়ন না করে তবে এই দেশ কোনোদিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে না। ফলে এটিই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা

- শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেশ বেশি উন্নত সে দেশ সার্বিকভাবে তত বেশি উন্নত। তাই বলা চলে যে, আমাদের দেশের অনগ্রসরতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে না পারলে এই দেশ কখনও কাম্য মাত্রায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় আসীন হতে পারবে না। এছাড়া আরও একটি সমস্যা হলো শিক্ষাজীবন শেষ করার পর এদেশের অধিকাংশ জনগণকে বেকারত্বের বোঝা বহন করতে হয়। ফলে বেকারত্ব দূর করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এ অভিশপ্ত বেকারত্ব দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বমানচিত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে ঠিক তেমনি ক্ষুধা, চরম দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, নানা প্রকারের রোগব্যাধির কারণে বাংলাদেশ একটি সমস্যার জালে আবদ্ধ রয়েছে। তাই অর্জনের সাথে সাথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে ভবিষ্যতে আরও কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে সরকারের সাথে সাথে সকল বেসরকারি সংস্থা (NGO), পেশাজীবী সর্বোপরি সকল শ্রেণির মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

❑ সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হলো যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোনো বৃহৎ শক্তির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই বাংলাদেশ কোনো নির্দিষ্ট বলয়ে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে।

❑ আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন:

জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

➢ সম্মান প্রদর্শন

বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। এই মূলনীতিটি জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

➢ হস্তক্ষেপ না করা

অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মূলনীতিটিও জাতিসংঘ সনদের ২(৭) অনুচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

➢ বিশ্ব শান্তি

- বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।
- বাংলাদেশ যেকোনো বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতি এবং
- বাংলাদেশ চায়, যেকোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি
- জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি
- অর্থনৈতিক অগ্রগতি
- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা
- নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা

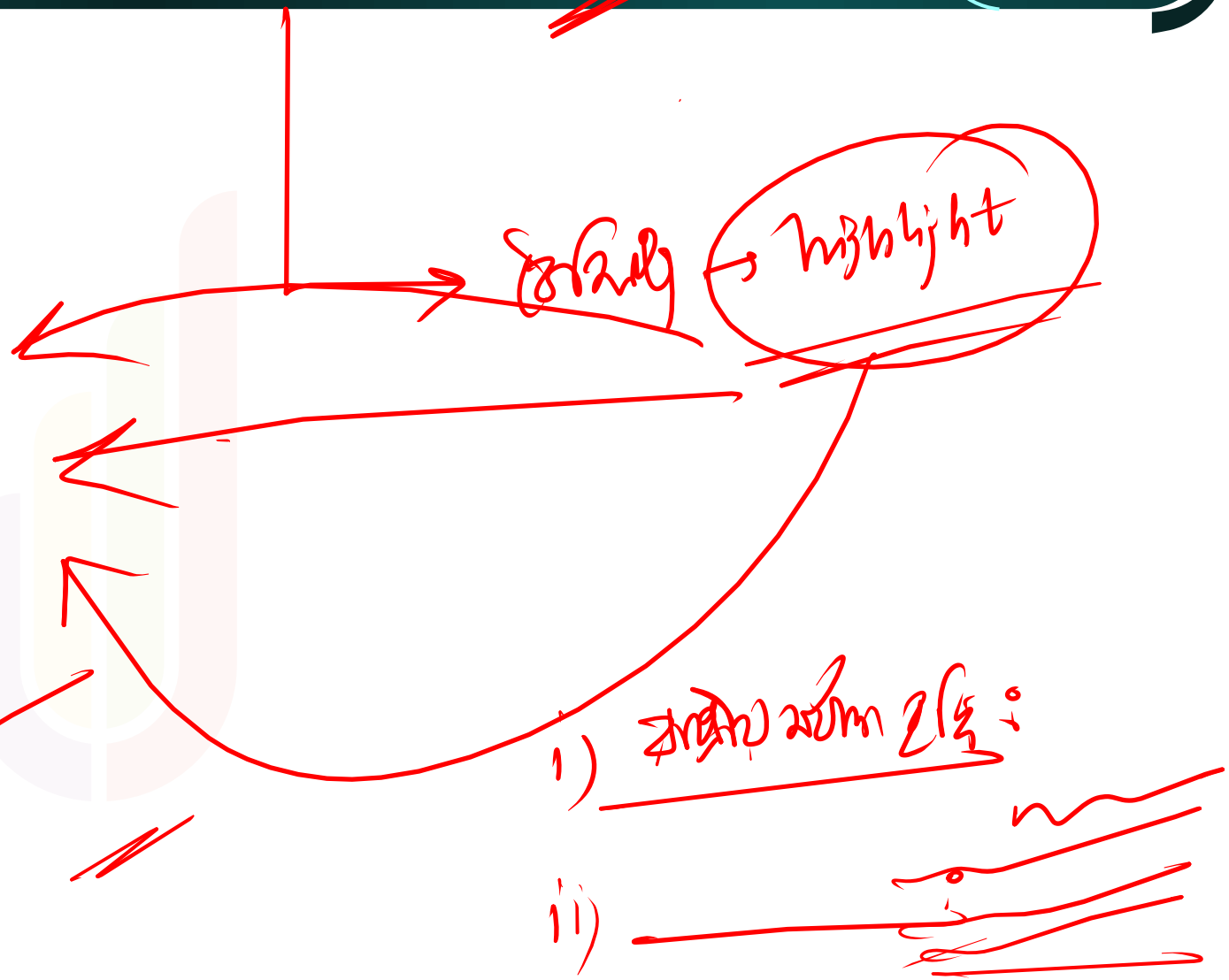

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

- ভৌগোলিক-কৌশলগত অবস্থান
- জনসংখ্যা
- জনমত ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
- অর্থনৈতিক অগ্রগতি
- রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতাদর্শ
- সামরিক সামর্থ্য
- প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ

PROBLEM SOLVING ও POLICY BRIEF (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়

Problem Solving (সমস্যা সমাধান)			Policy Brief (নীতিপত্র)		
Problem Solving উত্তর করার সময় ৬টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে -			Policy Brief উত্তর করার সময় ৮টি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে -		
প্রথম অংশ	:	ভূমিকা	প্রথম অংশ	:	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
দ্বিতীয় অংশ	:	সমস্যার প্রেক্ষাপট	দ্বিতীয় অংশ	:	স্মারক নং ও তারিখ
তৃতীয় অংশ	:	সমস্যার বর্তমান পরিস্থিতি	তৃতীয় অংশ	:	সমস্যার শিরোনাম
চতুর্থ অংশ	:	সমস্যার প্রভাব	চতুর্থ অংশ	:	ভূমিকা
পঞ্চম অংশ	:	সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ	পঞ্চম অংশ	:	সমস্যার প্রেক্ষাপট
ষষ্ঠ অংশ	:	International Reference	ষষ্ঠ অংশ	:	সমস্যার প্রভাব
			সপ্তম অংশ	:	সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ
			অষ্টম অংশ	:	International Reference

PROBLEM SOLVING ও POLICY BRIEF (নীতিপত্র) এর জন্য অনুসরণীয়

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
[উদাহরণ]
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
৩৮, আবদুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০

স্মারক নং : .....

তারিখ: .....

শিরোনাম
[উদাহরণ]
নীতিপত্র/পরামর্শপত্র: রোহিঙ্গা সমস্যা ও বাংলাদেশের করণীয়

ভূমিকা : ঘটনার প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে। ----------

---

সমস্যার প্রেক্ষাপট : শুরু থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা তুলে ধরতে হবে। ----------

---

নির্দেশাবলী:

অত্যাধিক লেখার জন্য নতুন কর্তন করা হবে।

সমস্যার প্রভাব : ----------

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশ : ----------

উপসংহার : ----------

আন্তর্জাতিক রেফারেন্স :

১. ----------
২. ----------
৩. ----------

[একটি পলিসি ব্রিফ অন্তত তিন থেকে চার পৃষ্ঠা লিখুন।]

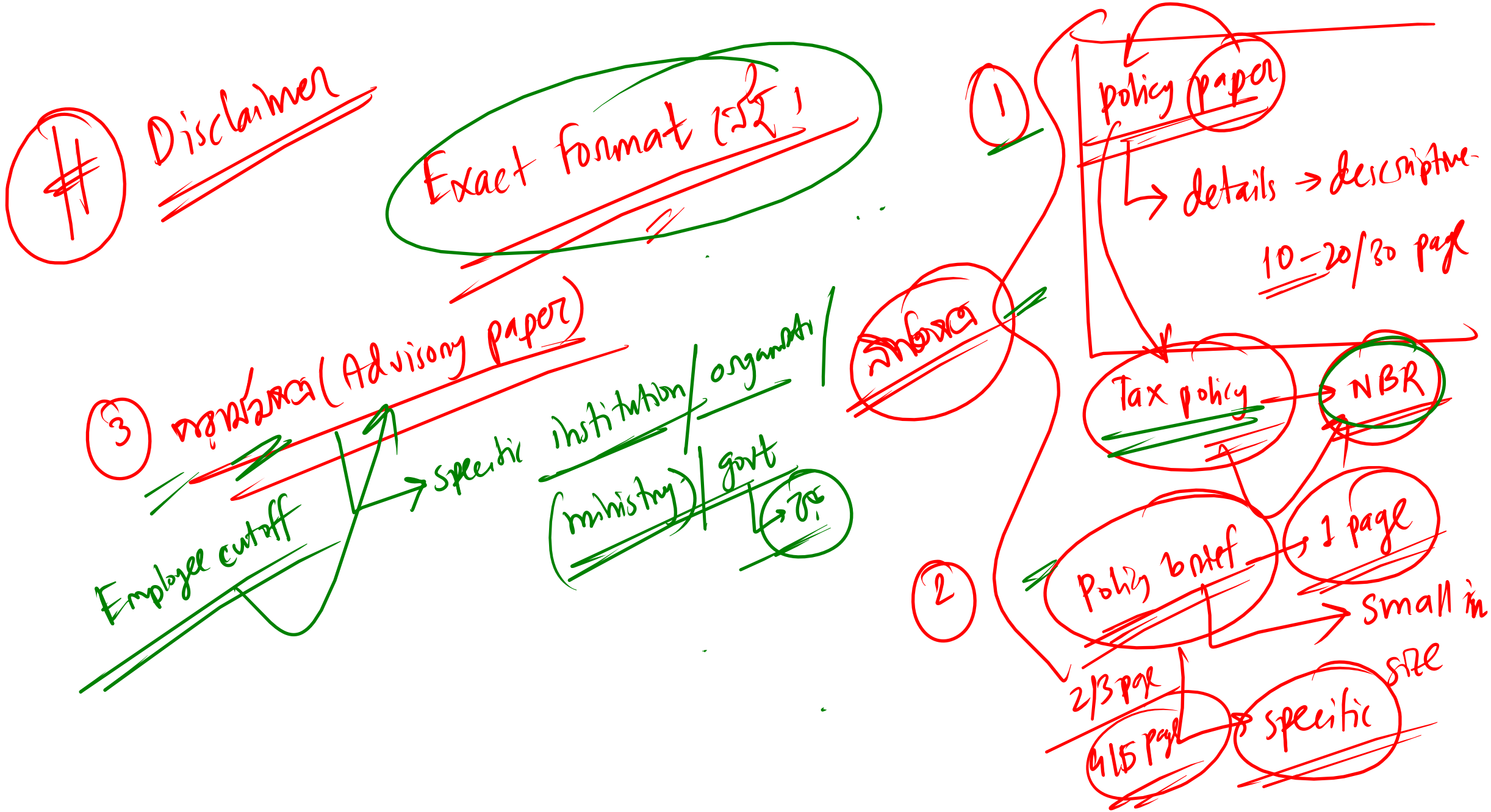

Disclaimer

Exact format দেব।

3 পরামর্শপত্র (Advisory paper)

Employee cutoff → specific institution / organization / (ministry) / govt

1 policy paper → details → descriptive
10–20/30 page

নীতিপত্র

Tax policy → NBR

2 Policy brief → 1 page → small in size
2/3 page
4/5 page → specific

Policy paper / policy brief

i) Thesis paper → Executive Summary (Abstract)

ii) PHD Research. → Intro → Bibli / Index

- → Problem Statement
- → Background
- → Challenge
- → Recommend / Analysis
- → Reference
- → Conclusion
- → Bibl

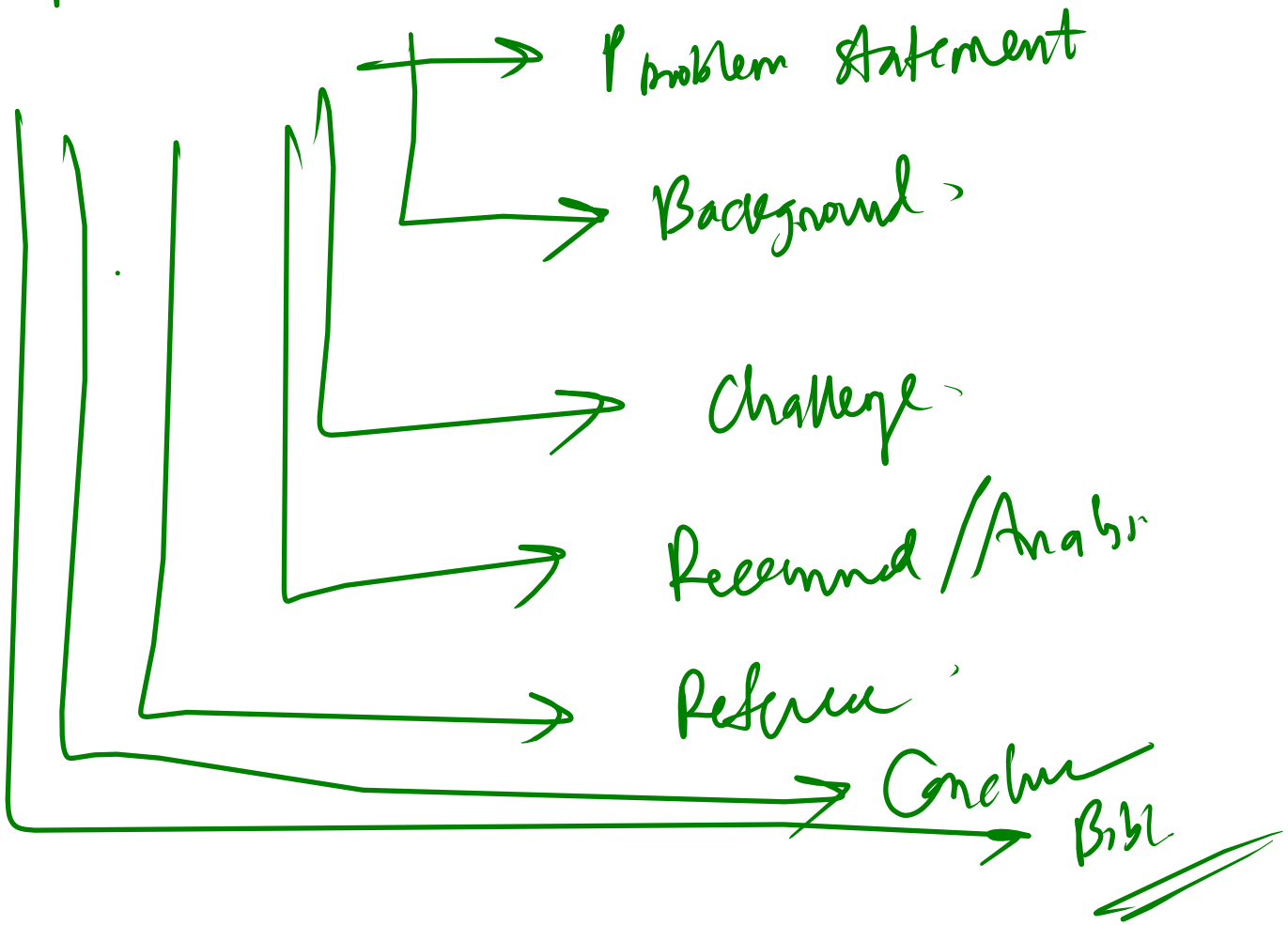

Format

optional

স্মারক নং - 190

i) সরকারের মনোগ্রাম
ii) মন্ত্রণালয়

{গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়}

তারিখ : ১১ আগস্ট, ২০২৫

Title/শিরোনাম:

(i) Executive Summary (সারাংশ / ~~ভূমিকা~~ / ভূমিকা)

(ii) Background (পটভূমি)

(iii) বর্তমান অবস্থা (present) / Problem Statement (সমস্যা)

(iv) চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenge)

→ sub para

(v) সুপারিশমালা / করণীয়সমূহ

(i)

(vi) বাস্তবায়ন কৌশল : (Imple

(vii) ~~Conclusion~~ / Reference:

(viii) **Reference:**

i) [illegible]

ii) [illegible]

iii) Daily Star

(iv) ______ , ______

(v) Commerce, www.moc.gov.bd

Author name [illegible]

FAQ

i) Data, chart, graph ??

ii) map ??

iii) quotation

i) Data, chart, graph, Table

Challenge

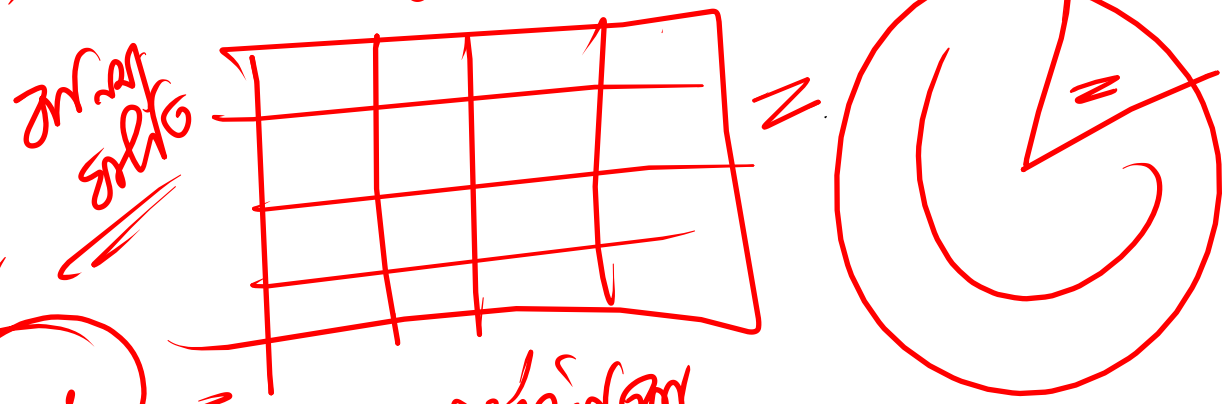

reference

Background

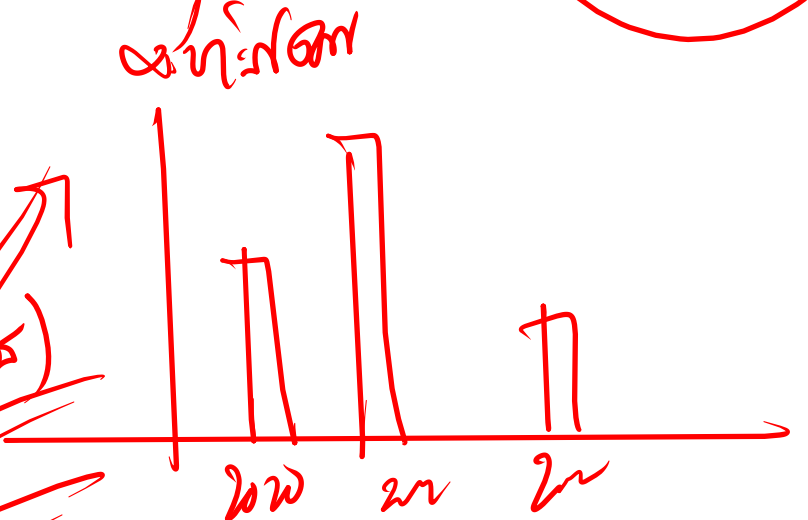

Reference style :-

(ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)
চ)

i) মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট-
ii) তথ্য অধিদপ্তর
(iii) অর্থনৈতিক সমীক্ষা
(iv) BBS, CNN,
(v) হতে প্রকাশিত
(vi) উদ্ধৃতি

Essay

~~poverty is a big~~

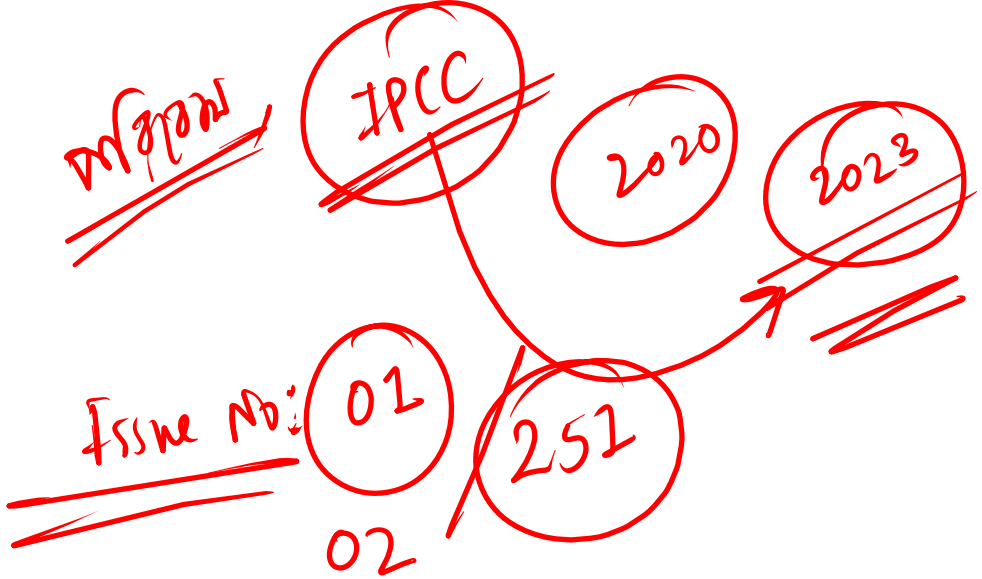

পত্রিকার IPCC 2020 2023

Masthead paper / Letter head pad

Issue No: 01 251

02

Blue Economy cell

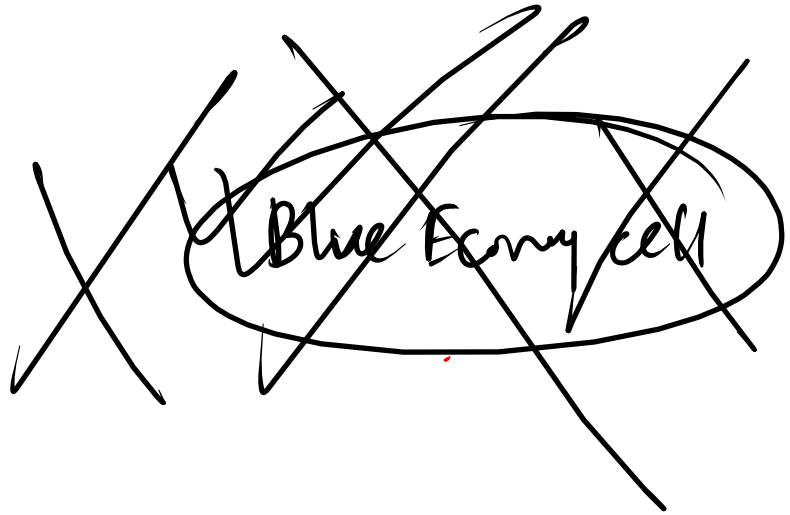

250

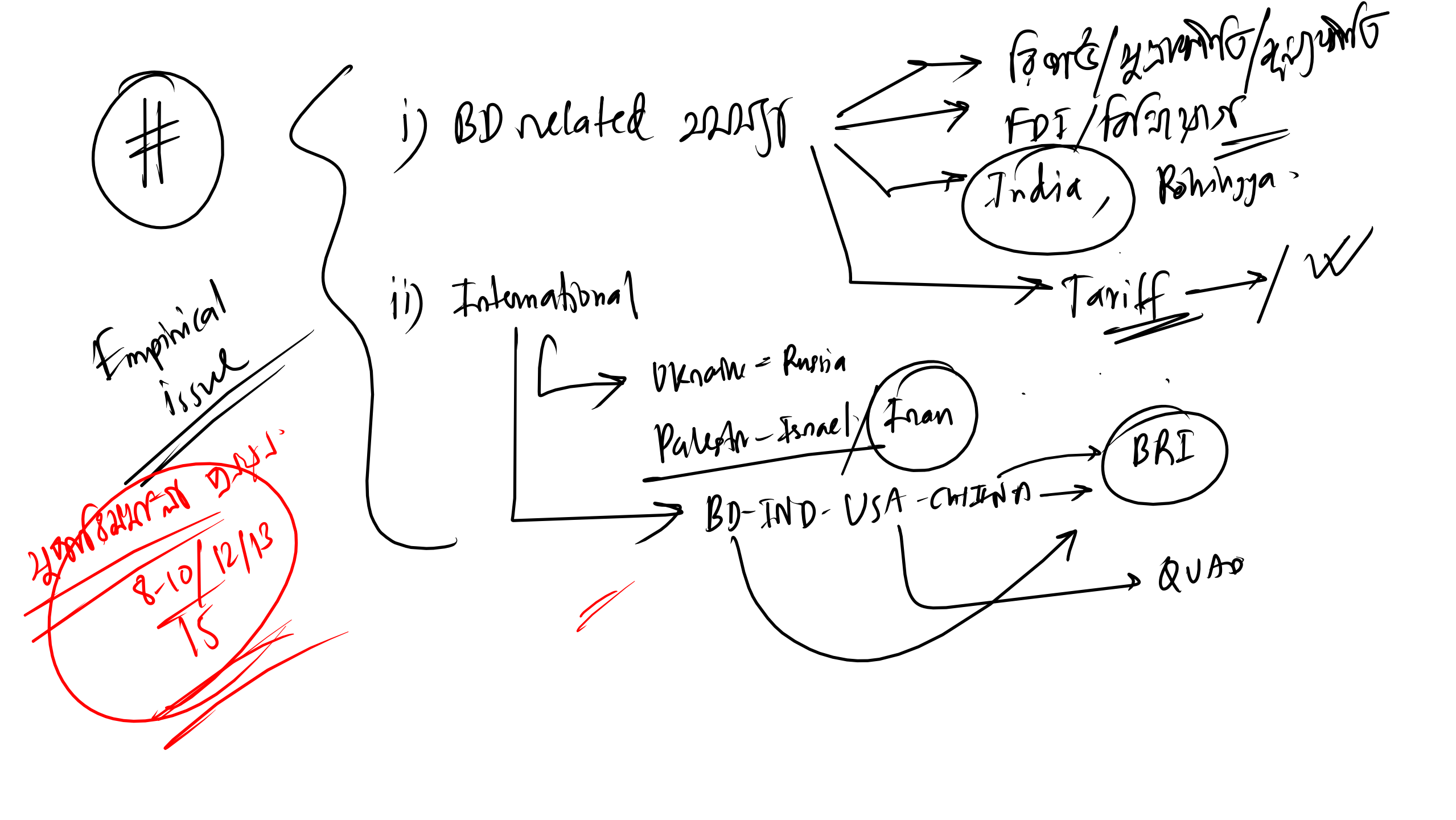

#
Empirical issue
i) BD related
ii) International
FDI
India
Rohingya
Tariff
Ukraine - Russia
Palestine - Israel
Iran
BD - IND - USA - CHINA
BRI
QUAD
8-10/12/13

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

❑ সমস্যা

❖ **পানি বণ্টন সমস্যা :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তাসহ ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এসব নদীর পানি প্রবাহ ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলে বাংলাদেশ পানির প্রবাহের জন্য ভারতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, যৌথ নদীগুলোতে বাঁধ নির্মাণ ও বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে নদীর পানি বণ্টন বিষয়ক সমস্যা রয়েই গেছে।

➢ **ফারাক্কা বাঁধ:** ১৯৬১ সালে গঙ্গায় এর নির্মাণ কাজ শুরু করে ভারত যা ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল চালু করে। ৭৩৫০ ফুট লম্বা এই বাঁধটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জুড়ে অবস্থিত। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ কমে গেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **তিস্তা বাঁধ:** বাংলাদেশ সীমান্তের ৬০ কিলোমিটার উজানে ভারত তিস্তা নদীর পানিপ্রবাহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে জলপাইগুড়ির গজলডোবাতে তিস্তা বাঁধ নির্মাণ করে। দুই দেশের যৌথ নদী কমিশন একাধিক বৈঠক করে তিস্তার পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান করতে ঐক্যমত্য হলেও এখন পর্যন্ত তা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এই বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহ যেমন আত্রাই, পুনর্ভবা, করতোয়া, বাঙালি ইত্যাদি শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে, ছোট ছোট অনেক নদী ইতোমধ্যে মরেও গেছে। নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় উত্তরাঞ্চলের জন্য প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকায় নির্মিত দেশের সবচেয়ে বড় সেচ প্রকল্প অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

- **টিপাইমুখ বাঁধ:** বাংলাদেশের সিলেটের সীমান্ত থেকে ১০০ কিলোমিটার উজানে ভারতের মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখে বরাক ও তুইভাই নদীর মোহনায় জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাঁধের নাম টিপাইমুখ বাঁধ। পরিবেশবিদরা আশঙ্কা করছেন, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা অববাহিকার ২৭৫.৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়সহ এই অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, প্রাণিবৈচিত্র্য সবকিছুর উপর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি কুফল দেখা দেবে, ঐ অঞ্চলের স্বাভাবিক পরিবেশ ও ইকোসিস্টেমকে বাধাগ্রস্ত করবে।

- **আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প :** ভারত তার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পানি ঘাটতি সম্পন্ন রাজ্যগুলোর পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অববাহিকার সকল নদ নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং খাল কেটে পানি সরবরাহের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই মহাপরিকল্পনায় ভারতের ছোট-বড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে জুড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্ষার সময় ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় প্রাপ্ত অতিরিক্ত পানি শুকনো মৌসুমে কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য ৭৪টি জলাধার ও বেশ কিছু বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে ধরে রাখা হবে। ভারতের এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য তা ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

- **সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ:** আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ভারত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হলে মহীসোপানের দাবিকে ঘিরে দুই দেশের পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং বেইজ লাইন নিয়ে আপত্তি নতুন এক বিরোধ সামনে এনেছে। মহীসোপানের দাবি নিয়ে দুই দেশই জাতিসংঘে চিঠি দিয়েছে। বাংলাদেশের নতুন বেইজ লাইনের ২ ও ৫ নম্বর পয়েন্টের অবস্থান নিয়ে ভারতের আপত্তি। বাংলাদেশ বলছে আন্তর্জাতিক আইন মেনেই আমরা বেইজ লাইন ঠিক করেছি বরং ভারতের ৮৭ ও ৮৯ নম্বর বেইজ লাইন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- **সীমান্তে হত্যা :** বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝে রয়েছে ৪,১৫৬ কিলোমিটার সীমান্ত, যা বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম সীমান্ত। ভারতের সাথে আরো পাঁচটি দেশের সীমান্ত থাকলেও বাংলাদেশের সাথেই সীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ। এই সুদীর্ঘ সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মাদক পাচার ইত্যাদি সমস্যাও প্রকট। ফলে প্রায়শই ভারতের বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়ার খবর শোনা যায়। গত ১২ বছরে মোট ৩৩৫ জন বাংলাদেশি নিহত হন বিএসএফের হাতে।

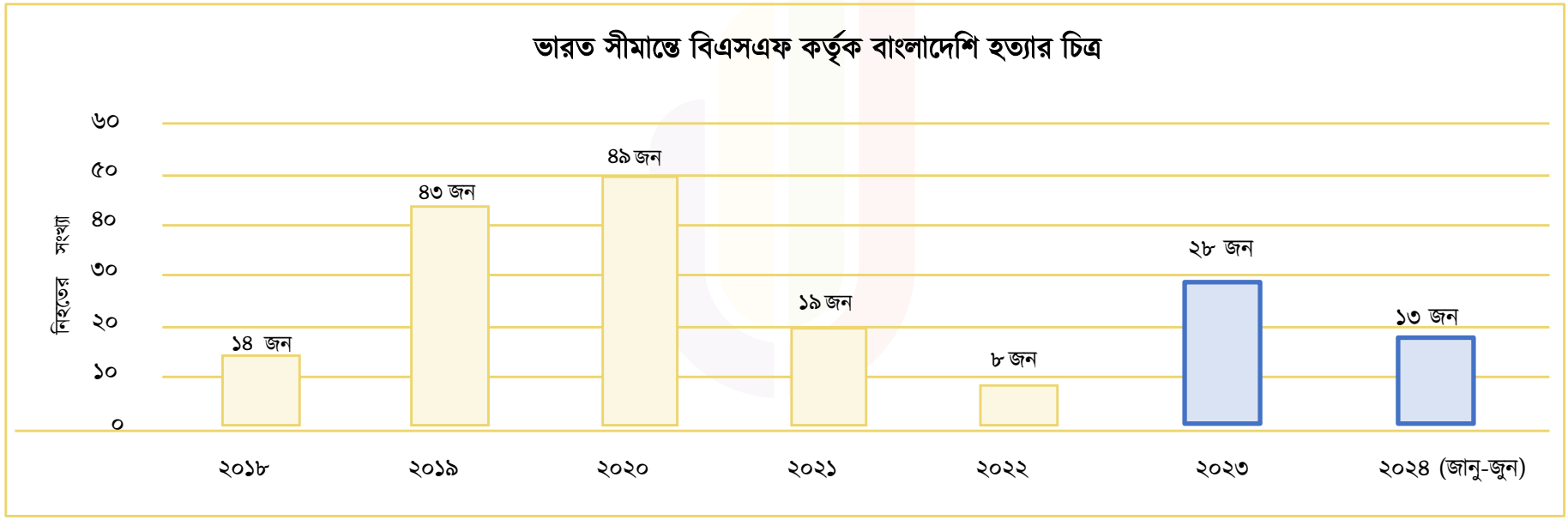

[তথ্যসূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০২২]

- **বাণিজ্যে ঘাটতি :** ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি বাংলাদেশের জন্য ২য় বৃহত্তম বাণিজ্য ঘাটতি। ভারত বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাছাড়াও ভারত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে Anti-Dumping Duty ও Counterveiling Duty আরোপ করে বাণিজ্য বাধা সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে আবার ভারত বাংলাদেশে জরুরি ভোগ্যপণ্য কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে সংকটের সৃষ্টি করে।

- **NRC তালিকা:** ২০১৯ সালের ৩০ আগস্ট প্রকাশিত হয় আসামের National Register of Citizens (NRC) তালিকা। তালিকা থেকে ১৯ লাখ বাঙালি বাদ পড়েছে বলে জানানো হয়। তালিকার সারমর্মে বলা হয়, বাদ পড়া অধিবাসীরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগে গিয়েছেন এমনটা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

- ✓ ৫ আগস্ট অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক শীতলতা।

❑ সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ (Recommendations)

➢ বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারতের সাথে বিরোধ মেটাতে ন্যায্যতার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়নের জন্য ভারতকে চাপ দিতে বাংলাদেশ কিছু বিষয় সামনে নিয়ে আসতে পারে:

- ✓ বাংলাদেশ ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি সনদ এবং ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ সনদ উল্লেখ করে ভারতকে তা মেনে চলার আহ্বান জানাতে পারে। ১৯৬৬ সালের অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত হেলসিংকি নীতিমালায় বলা হয়েছে, "প্রতিটি অববাহিকাভুক্ত রাষ্ট্র অভিন্ন নদীগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজন বিবেচনায় নিবে।" আবার ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ কনভেনশন অনুযায়ী প্রণীত আইনে বলা হয়েছে, "নদীকে এমনভাবে ব্যবহার করা যাবে না, যাতে অন্য দেশ মারাত্মক ক্ষতি বা বিপদের মুখে পড়বে"।
- ✓ বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে ভারত পণ্য পরিবহনের জন্য তুলনামূলক অত্যন্ত স্বল্প খরচে ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট সুবিধা ভোগ করে আসছে। এটি বাংলাদেশের কাছে ভারতের অন্যতম প্রধান স্বার্থ। ভারতকে নদীর পানি বণ্টনের জন্য কার্যকর চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ এই ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট সুবিধাটি ব্যবহার করে কূটনৈতিক চাপ দিতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) হলো একটি আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তি যা পণ্য ও পরিষেবা, বিনিয়োগ, অবকাঠামো প্রকল্প এবং ই-কর্মাস ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নৈতিকতার অংশ নিয়ে আলোচনা করে। এটি বাংলাদেশ ও ভারতের নিজস্ব ব্যবসার নিয়ম-নীতি বা পলিসিগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে দুই দেশকে পরস্পরের সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেয়। দুই দেশের জন্যই বিনিয়োগের নতুন জানালা খুলে দিবে সিইপিএ।

- যেহেতু বাংলাদেশ BIMSTEC, ASEAN, BCIM ইত্যাদি বাণিজ্যিক জোটগুলোর Transit কেন্দ্র, সেহেতু ভারত বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হতে বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে। এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ভারতের কাছে তার নিজের দাবিগুলো পেশ করতে পারে।

- NRC ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে স্পষ্ট করে দিতে পারে যে, ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পর ভারতে গেলেও এর আগে যদি তার পিতা-মাতা বা পরিবারের কেউ ভারতে যেয়ে থাকে তাহলে তারা অবৈধ বাংলাদেশি হতে পারে না। তাছাড়া ভারতকে ১৯৫৪ সালের ইতিহাস মনে করিয়ে দিতে পারে যখন মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন সময়ে এনআরসি বিভিন্নভাবে সংশোধিত হয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সমস্যা

- বাংলাদেশে প্রচুর ভারতীয় নাগরিক বৈধ-অবৈধভাবে অবস্থান করে কাজ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) এর এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে বাংলাদেশ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ২য় বৃহত্তম উৎস। বাংলাদেশ সরকার অবৈধভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগের কথা বলে ভারত সরকারকে এই বার্তা প্রেরণ করতে পারে যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বৈষম্য দূর করে সমতা না আনলে বাংলাদেশও কঠোর অবস্থানে যেতে পারে।

- বাণিজ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য বাংলাদেশ ভারতকে মনে করিয়ে দিতে পারে যে বাংলাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি হিস্যার উৎস। বাংলাদেশের সাথে রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় সীমান্ত। এই সীমান্ত অঞ্চলে চোরাচালান, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ ভারতকে একযোগে কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে বিনিময়ে বাংলাদেশের সাথে ভারতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে ঘাটতি দূর করা ও অন্যান্য উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানাতে পারে। এছাড়াও ভারত থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারকে আরো স্বনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

❑ International References

- ১৯৬৬ সালের হেলসিংকি সনদ ও ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘের জলপ্রবাহ সনদ মেনে চলতে পারে।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক আদালত ITLOS ও PCA এর রায় কার্যকর করা যেতে পারে।
- আন্তর্জাতিক স্থলসীমা আইন মেনে BSF তাদের কার্যক্রম চালাতে পারে। আন্তর্জাতিক স্থলসীমা আইন অমান্য করলে তার জন্য International Law and Territorial Boundary এর আওতায় মামলা করা যেতে পারে।

❑ সমস্যা ও স্বার্থ: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ভারত ও চীনের অবস্থান

➢ **সাংস্কৃতিক :** ভারত এবং চীন, দুটি দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক এবং সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। তবে এর মধ্যে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে ভারতের সঙ্গেই বাংলাদেশের সম্পর্কটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। চীনের তুলনায় ভারত যেদিকে এগিয়ে আছে, তা হলো বাংলাদেশের ওপর তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব।

➢ **বাণিজ্যিক :** বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় চীন-ভারত দুটি দেশই মূলত বাণিজ্যকেই ব্যবহার করতে চাইছে। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন ও ভারত থেকেই। বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। দুটি দেশেরই বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে বাংলাদেশের সঙ্গে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য কেমন, তা জানা যায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যেও।

ভারত ও চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানির চিত্র

ভারত		চীন	
২০১৯-২০	৬,৬৬৩ মিলিয়ন ডলার	২০১৯-২০	১৪,৩৬০ মিলিয়ন ডলার
২০২০-২১	১০,৩৩৪ মিলিয়ন ডলার	২০২০-২১	১৬,৯৭৪ মিলিয়ন ডলার
২০২১-২২	১০,০২৬ মিলিয়ন ডলার	২০২১-২২	১৬,১৩৯ মিলিয়ন ডলার
২০২২-২৩	৬৫৭১ মিলিয়ন ডলার	২০২২-২৩	১৪৩৭৭ মিলিয়ন ডলার
২০২৩-২৪	৫৯১৮ মিলিয়ন ডলার	২০২৩-২৪	১২৫৫৩ মিলিয়ন ডলার

[তথ্যসূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৪]

➢ **বিনিয়োগ:** বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত চীনের বিনিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৫ বছরে গড়ে চীন প্রায় ৮-৯ বিলিয়ন ডলার হারে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ভারত ও চীনের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হলো –

চীনের বিনিয়োগ		ভারতের বিনিয়োগ	
অর্থবছর	বিনিয়োগের পরিমাণ	অর্থবছর	বিনিয়োগের পরিমাণ
২০২০-২১	১০ বিলিয়ন ডলার	২০২০-২১	১.৩৭ বিলিয়ন ডলার
২০২১-২২	৯.৪০ বিলিয়ন ডলার	২০২১-২২	৩.০০ বিলিয়ন ডলার
২০২২-২৩	১০.৮ বিলিয়ন ডলার	২০২২-২৩	৩.১৫ বিলিয়ন ডলার

➢ **অবকাঠামো খাতে প্রতিযোগিতা :** দুটি দেশই বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছে। বাংলাদেশে বড় আকারে রেল প্রকল্পে আগ্রহী দুটি দেশই। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনেও ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে উভয় দেশের। ভারত ও চীনের অবকাঠামো সহায়তাগুলো তুলে ধরা হলো –

ভারত	চীন
■ রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাগেরহাট ■ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (শিলিগুড়ি, কলকাতা – পার্বতীপুর, দিনাজপুর) ■ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ	■ বঙ্গবন্ধু টানেল ■ পদ্মাসেতু রেল সংযোগ প্রকল্প ■ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ■ ইস্টার্ন রিফাইনারির ২য় ইউনিট স্থাপন ■ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ

- **সামরিক খাতে প্রতিযোগিতা :** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে চীনা ট্যাংক, নৌবাহিনীকে রণতরী, মিসাইল বোট এবং বিমান বাহিনীকে ফাইটার জেট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। ২০০২ সালে চীন এবং বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার আওতায় মিলিটারি প্রশিক্ষণ রয়েছে। ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদেশ চীনা অস্ত্রের অন্যতম বড় ক্রেতা হয়ে উঠছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী চীন থেকে দুইটি সাবমেরিন নবযাত্রা ও জয়যাত্রা তার অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত করে। এ ছাড়াও, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে এফএম-৯০ ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে। অন্যদিকে ভারত এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। কেননা ভারতের সামরিক সরঞ্জামের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে বাংলাদেশের।

- **অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অবস্থান :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে চীনের প্রভাব তেমন লক্ষ করা না গেলেও ভারতের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতির পট পরিবর্তন হলে ভারতের দুশ্চিন্তা হয় তার কারণ হলো বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক দল এখনো পাকিস্তানকে সমর্থন দেয় এবং সাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনা ধারণ করে। এসব রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে ভারত দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে সমস্যায় পড়ে যায়। এজন্য বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ভারতের সবসময় নজর থাকে।

চীন-ভারত-বাংলাদেশ

- **সাম্প্রতিক সমস্যা:** সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ভারত ও চীনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। আর এই প্রশ্নগুলোই হলো- বাংলাদেশ-ভারত-চীন সম্পর্কের গতিধারার ক্ষেত্রে বাঁধা। **যেমন:**
  - ✓ ভারত ও জাপান বাংলাদেশকে QUAD এ যোগদান করতে বললে বাংলাদেশ একরকম রাজি হয়ে যায়। কিন্তু চীনের চাপে বাংলাদেশ আর QUAD-এ যোগদান করেনি।
  - ✓ চীন বাংলাদেশের সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করতে চাইলে ভারত আপত্তি তুলে। ভারতের আপত্তির কারণে বাংলাদেশ এ প্রকল্প বাতিল করে।
  - ✓ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ভারতের উদ্যোগে বাংলাদেশকে IPEF এ আমন্ত্রণ জানালে চীন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে ‘আমরা (চীন ও বাংলাদেশ) এসব জোট ছাড়াই ভালো আছি। এখন বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ কী করবে?’
  - ✓ শি জিন পিং এর উদ্যোগে গঠিত ‘Belt and Road Initiative’ এর বিকল্প হিসেবে নরেন্দ্র মোদির ‘Cotton Road Initiative’ এ বাংলাদেশকে যোগ দিতে তাগিদ দেয় ভারত।

দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলে চীন ও ভারতের মধ্যে নানা কারণে সম্পর্কের সংকট তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই সংকটে বাংলাদেশের অবস্থান যেন কারো জন্য অস্বস্তিকর না হয়, সে ব্যাপারে বাংলাদেশ সবসময় তৎপর। চীন বা ভারত কারো জন্যই তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অবনতি উসকে দেওয়া বা সহায়তা করার মতো কোনো অবস্থানকে বাংলাদেশ কোনোভাবেই সঠিক মনে করে না বরং আশা করে, এ অঞ্চলের এই দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যেও পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠুক।

❑ সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ (Recommendations)

- বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই দেশের সাথে আলাদা আলাদা সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে হবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত থেকে ভোগ্যপণ্য বেশি আমদানি করে। অন্যদিকে চীন থেকে ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ বেশি আমদানি করে।
- বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে চীনের সহায়তা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। এ নিয়ে ভারত যেন বাংলাদেশকে ভিন্নভাবে না দেখে সে ভুল ভাঙানো যেতে পারে।
- SAARC ও ASEAN এর ট্রানজিট কেন্দ্রে অবস্থিত বাংলাদেশ। তাই চীন কিংবা ভারত যেন বাংলাদেশকে সাকো হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- চীন ও ভারত কেন্দ্রীক প্রকল্প সহায়তা থেকে বের হয়ে অন্যদের সুযোগ দিলে ভারত ও চীনের ভুল ভাঙবে। যেমন: BIG-B, মেট্রোরেল ও মহেশখালি বিদ্যুৎকেন্দ্রে জাপান সহায়তা দিচ্ছে। ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নে নেদারল্যান্ডস সহায়তা দিচ্ছে।
- ভারত ও চীনকে পাশ কাটিয়ে SEACO, D-8 এর মতো নতুন জোট গঠন করা যেতে পারে।
- 'বাংলাদেশের উন্নয়নে যারা অংশীদার সকলেই বাংলাদেশের বন্ধু' – এই মতবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত ও চীনের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ, ভারত ও চীন সবাই APTA ও BCIM এর সদস্য। এই দুটি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ধারণার কার্যকারিতার জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, যাতে বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির বিষয়টি মীমাংসা করতে পারে।
- বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত ও চীনকে সাময়িকভাবে এড়িয়ে চলা। এই দুটি দেশের কঠোর ঋণ নীতি বাংলাদেশের জন্য বোঝা হয়ে যাচ্ছে।

- Cotton Road পরিকল্পনা ও মার্কিন FOIP Strategy এর অংশীদার হিসেবে ভারতের কাছে এবং New Silk Road কর্মসূচির জন্য চীনের নিকট বাংলাদেশ খুবই স্পর্শকাতর ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট। তাই ভারত ও চীনকে তাদের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিয়ে এই প্রভাব মোকাবিলা করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীন ও ভারতের মধ্যে একটা ভারসাম্য নীতি বজায় রেখেছে। কিন্তু এর ভারসাম্য রাখাটা কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থতা যেকোনো একটি দেশের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করতে পারে। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সফলতা নির্ভর করবে কতটা দক্ষতার সঙ্গে বাংলাদেশ এ ভারসাম্যের দঁড়িতে হাঁটতে পারে।

❑ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের গতিধারা

১৯৭১ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ৫০ বছরে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক তুলে ধরা হলো-

- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিপক্ষে কাজ করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং সম্পর্কের নতুন ধারার সূচনা করে।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উপর চালানো গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের 'লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন' প্রতিষ্ঠান।
- ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বাধাগুলো চিহ্নিত করতে এবং সমাধানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা Trade and Investment Co-operation Forum Agreement (TICFA) নামে পরিচিত।
- যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সংকটে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর চালানো সহিংসতা মানবতাবিরোধী অপরাধ 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্য নানাভাবে মানবিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার যে তহবিল রয়েছে, সেখানে সবচেয়ে বেশি ডোনেট করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও মিয়ানমারের সেনা শাসনের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

❑ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক

- FDI (১৯%) – UNCTAD এর হিসাব অনুযায়ী ২০২২ পর্যন্ত দেশে মোট এফডিআই এর পরিমাণ ২১.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এফডিআই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র হতে যা মোট এফডিআই এর ১৮.৯ শতাংশ (৩.৯৪৮ বিলিয়ন ডলার)। UNCTAD-এর বিশ্ববিনিয়োগ প্রতিবেদন ২০২৪ অনুযায়ী বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) হয় ৩০০৪ মিলিয়ন ডলার।
- গ্যাস (৬৪%)- দেশে বর্তমানে দৈনিক গড়ে ২ হাজার ২৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৬৩.৬৪% করছে জ্বালানি খাতের মার্কিন প্রতিষ্ঠান শেভরন। বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি রয়েছে ২০৩৩-৩৪ পর্যন্ত।
- ২০২৪ সালে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করেছে ৮.৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা গত বছরের তুলনায় ১.১ শতাংশ বা প্রায় ৮৯.৩ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির এই দেশটি থেকে জুলাই-মার্চ সময়ে ৩৯৪ কোটি ৬১ লাখ (৩.৯৪ বিলিয়ন) ডলার এসেছে, যা মোট রেমিটেন্সের ১৮ দশমিক ১১ শতাংশ।
- বীমা (৩৮%)- দেশে বীমা খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২৯ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ মার্কিন প্রতিষ্ঠান মেটলাইফের। খাতটিতে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩৮ শতাংশ মেটলাইফের।

- রেমিট্যান্স (১১.১%)- রেমিট্যান্স উৎস হিসেবে সৌদি আরবের পরই যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স আসে ১৬৭৫.১ মিলিয়ন ডলার। যা বাংলাদেশের মোট প্রবাসী আয়ের ১১.১ শতাংশ।

- যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা এই রেমিটেন্স গত অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। শতাংশ হিসাবে বেড়েছে ১০৩ দশমিক শতাংশ।

❑ সাম্প্রতিক সমস্যা

সম্প্রতি কিছু ঘটনার কারণে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাগুলো হলো-

- IPS, IPEF এ বাংলাদেশকে যোগদানের প্রস্তাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু চীনের কূটনৈতিক চাপের কারণে বাংলাদেশ অনাগ্রহ প্রকাশ করে।
- অতি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ দপ্তরের 'অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি) বাংলাদেশের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড একশন ব্যাটিলিয়ন (র‍্যাব)-এর সাবেক ও বর্তমান সাত শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নিপীড়নের অভিযোগ এনে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
- বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রথম হোঁচট খায় গণতন্ত্র সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে। তবে র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে লেহি আইনে সই করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। লেহি আইনে সই না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়। লেহি আইনে সই করলে নিরাপত্তা সংস্থাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে সহায়তা বন্ধ হবে বলে শর্ত দেওয়া হয়।
- জুন, ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে জিএসপি সুবিধা স্থগিত করে। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া শর্তের অনেকগুলো পূরণ করলেও যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করেনি।
- বাংলাদেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বারবার প্রশ্ন উত্থাপন করছে যুক্তরাষ্ট্র।

❑ সমস্যার প্রভাব

- দুই দেশের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সংযোগ এখন ১২ বিলিয়ন (১ হাজার ২০০ কোটি) ডলার ছাড়িয়েছে, যা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক উন্নয়ন না ঘটলে তা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।
- রপ্তানি, এফডিআই ও রেমিট্যান্স বিবেচনায় দেশের অর্থনীতিতে সফট পাওয়ার (বাণিজ্যক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা) সবচেয়ে বেশি এখন যুক্তরাষ্ট্রেরই। ২০১৬ সালেও বাংলাদেশ থেকে ৫৯১ কোটি ১ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছিলো যুক্তরাষ্ট্র। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-২৪ অনুযায়ী বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৬১০৩.১৮ মিলিয়ন ডলারে। এ হিসেবে পাঁচ বছরে দেশটির বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি বেড়েছে ৪০% এর বেশি। সম্পর্কের এই অবনতি চলতে থাকলে বাংলাদেশ তার বৃহৎ রপ্তানি বাজার হারাবে।
- গত ৫০ বছর যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডি (USAID) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন, মাতৃত্ব ও শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, পল্লী বিদ্যুতায়ন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, ক্ষুদ্র ঋণ, মানবিক সহায়তাসহ বিভিন্ন খাতে সাত বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলে USAID এর কার্যক্রম বাংলাদেশে স্থগিত করে দিতে পারে।
- তৈরি পোশাকের সর্ববৃহৎ বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ যদি তাদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করতে না পারে তাহলে পোশাক খাত রপ্তানি বাজার হারাবে।

❑ সম্ভাব্য সমাধান ও সুপারিশ

- RAB যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেনি তার তথ্যপ্রমাণ দাখিল করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারে।
- বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত টেনে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা না দিলে বাংলাদেশকে কেন নিষেধাজ্ঞা দিবে- এই প্রশ্ন উত্থাপন করা। যেমন: ইসরায়েল প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেটাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলছে না।
- স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিটি দেশ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংগঠনে যোগদানের অধিকার রাখে।
- Good Office বা মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য ও কানাডাকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ এই দুটি দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভালো।
- আফগানিস্তান, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে বহুলোককে নির্বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে। এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়? এই প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশ আরো মনে করিয়ে দিতে পারে যে, ওয়াশিংটন জার্নালের প্রতিবেদনে ২০০৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৩৭০ জন খুন হয়েছে। এটি যদি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মানবাধিকার লঙ্ঘন না হয় তাহলে র‍্যাবের কার্যক্রম কেন মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে?
- জিএসপি সুবিধা ফিরে পেতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলো শর্ত পূরণ করেছে। এ তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদন দাখিল করা যেতে পারে।

চুক্তি, চুক্তির প্রকারভেদ, চুক্তির সাথে প্রটোকলের সম্পর্ক

❑ চুক্তি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য, যা একটি কিংবা দুই বা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ, তাকে চুক্তি বলে।

❑ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা

- ✓ চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়-দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- ✓ চুক্তি zero-sum-game-এর পরিবর্তে win-win game-এর পরিবেশ তৈরি করে।
- ✓ চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি নৈপুণ্য ইত্যাদি বিনিময় হয়, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ✓ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বিত ও টেকসই সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন হয়।

- ✓ চুক্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চুক্তি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুধু partnership সৃষ্টি করে না, benefit and risk ভাগাভাগির দ্বার উন্মোচন করে।
- ✓ চুক্তি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Potentiality of conflict-এর পরিবর্তে Potentiality of cooperation-এর ক্ষেত্র তৈরি করে।

❑ চুক্তির প্রকারভেদ

- ➢ **Treaty:** Treaty সাধারণত পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক এবং সাধারণত সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।
- ➢ **Convention:** Convention সাধারণত বহুপাক্ষিক চুক্তি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়। এর বিষয়বস্তু বা পরিধি ব্যাপক। সাধারণত Convention সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

- **Agreement:** Treaty বা convention-এর চেয়ে কম আনুষ্ঠানিকতায় সম্পাদিত হয় এবং সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান পর্যায়ে স্বাক্ষরিত হয় না। সরকারের বিভিন্ন Ministry বা Division-এর প্রধান এবং কারিগরি ও প্রশাসনিক চরিত্রের Agreement -এর ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

- **Protocol:** Protocol ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

✓ রাষ্ট্রাচার অর্থে (State behavior);

✓ পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে

✓ যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaty, Agreement) খসড়া অর্থে;

✓ মূল চুক্তির কোনো Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ চুক্তির অধীনে সম্পাদিত সম্পূরক বা পরিপূরক চুক্তি অর্থে।

মূলত, Protocol-Treaty, Agreement বা Convention-এর অতিরিক্ত অংশ। Head of the ministry or division-প্রধান এবং Attached department-এর ক্ষেত্রে Department-প্রধান কর্তৃক কম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

- **MoU:** MoU-হলো Less informal ঐকমত্য। অনেকটা Non-binding প্রকৃতির। Head of the ministry or Head of the division কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। MoU যদি কারিগরি বা প্রশাসনিক প্রকৃতির হয়, সে ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।
- **বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) :** আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোনো বিধান নেই যা দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণে বাধ্য করা যাবে। তবে বহিঃসমর্পণ চুক্তির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রকে বহিঃসমর্পণ করতে পারবে। যেমন: বাংলাদেশ ভারত ও থাইল্যান্ডের সাথে বহিঃসমর্পণ চুক্তি করেছে।
- **বহিঃসমর্পণ বা অপরাধী প্রত্যর্পণের শর্তসমূহ**

✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত নোটিশ দিতে হবে।

✓ প্রত্যর্পণের পূর্বে করা অন্য ফৌজদারি অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।

✓ প্রত্যর্পণ ব্যক্তির জাতীয়তা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

✓ অনুরোধকারী রাষ্ট্রে অপরাধীকে যে শাস্তি দিয়েছে তা গ্রাহক রাষ্ট্রে আইনেও সমান মর্যাদা পাবে।

✓ প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন কখনোই বহিঃসমর্পণের বাধ্য বাধকতা সৃষ্টি করে না।

✓ বহিঃসমর্পণ চুক্তিটি সবসময় দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপর্যুক্ত চুক্তিসমূহ ছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরও কিছু Soft ধরনের চুক্তি; যেমন: Modus Vivendi, Process Verbal-সহ অনেক ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিসমূহ Less formal এবং non-binding ধরনের।

❑ মৈত্রী চুক্তি ও নিরাপত্তা চুক্তির মধ্যে পার্থক্য

মৈত্রী চুক্তি	নিরাপত্তা চুক্তি
দুটি রাষ্ট্র যখন তাদের অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি স্বার্থ উদ্ধারে কোনো সহযোগিতা মূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে মৈত্রী চুক্তি বলা হয়।	একাধিক রাষ্ট্র যখন শুধু তাদের নিরাপত্তা সমুন্নত রাখার জন্য কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন তাকে নিরাপত্তা চুক্তি বলা হয়।
এখানে মানবিক সহায়তা হিসাবে কাজ করে।	এখানে সামরিক নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করে।
এ চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা থাকে না।	এ চুক্তিতে সদস্য দেশগুলো যদি অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে তবে সকল সদস্যরা একসাথে তা প্রতিহত করবে।
যেমন: ফ্রান্স ও USA এর মাঝে Treaty of Amity & Commerce. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি।	যেমন: Anzus, Aukus, NATO.

IMF এর ঋণ

❑ IMF ও বাংলাদেশের ঋণের ক্রমধারা

১৯৭৪ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ IMF থেকে ১১ বার ঋণ গ্রহণ করেছে। ২০০৩ ও ২০১২ সালের ঋণের অর্থ এখনো বকেয়া রয়েছে যথাক্রমে ৯৫৬০৪ (হাজার SDRs), এবং ২৭৪২৬৯ (হাজার SDRs,).

ঋণ গ্রহণের সময়	ঋণ পরিশোধের সময়সীমা	ঋণের পরিমাণ (হাজার SDRs)	বকেয়া অর্থের পরিমাণ(হাজার SDRs)
জুন, ১৯৭৪	জুন, ১৯৭৫	৩১২৫০	০
জুলাই, ১৯৭৫	জুলাই, ১৯৭৬	৬২৫০০	০
জুলাই, ১৯৭৯	জুলাই, ১৯৮০	৮৫০০০	০
ডিসেম্বর, ১৯৮০	জুন, ১৯৮২	২২০০০০	০
মার্চ, ১৯৮৩	আগষ্ট, ১৯৮৩	৬৮৪০০	০
ডিসেম্বর, ১৯৮৫	জুন, ১৯৮৭	১৮০০০০	০
ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭	ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০	২০১২৫০	০
আগস্ট, ১৯৯০	সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	৩৩০০০০	০
জুন, ২০০৩	জুন, ২০০৭	৩১৬৭৩০	৯৫৬০৪
এপ্রিল, ২০১২	এপ্রিল, ২০১৫	২৭৪২৬৯	২৭৪২৬৯

IMF এর ঋণ

❑ সাম্প্রতিক ঋণ

২৪ জুলাই, ২০২২ সালে বাংলাদেশে IMF কে ঋণ সহায়তার জন্য চিঠি পাঠায়। অনেক হিসাব-নিকাশ ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা পর্যালোচনা শেষে বাংলাদেশকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে IMF। সাত কিস্তিতে IMF এ ঋণ ছাড় করবে। গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ প্রথম কিস্তির ৪৭ কোটি ৬৩ লাখ ডলার এবং ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে ২য় কিস্তির ৬৮ কোটি ১০ লাখ ডলার পায় বাংলাদেশ। বাকি ঋণ প্রতি ছয় মাস পরপর সমান ৫টি কিস্তিতে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বুঝে পাবে বাংলাদেশ। ঋণের সুদের হার নির্ধারিত না, সুদ হার হবে পরিবর্তনশীল। তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে গড় সুদ হার হবে ২.২ শতাংশ। IMF বাংলাদেশকে এ ঋণ দিয়েছে ৩টি ক্যাটাগরিতে।

- ✓ Extended Credit Facility (ECF)- এর আওতায় ১১৫ কোটি ডলার।
- ✓ Resilience and Sustainability Facility (RSF)- এর আওতায় ১৪০ কোটি ডলার।
- ✓ Extended Fund Facility (EFF) – ২১৫ কোটি ডলার।

[তথ্যসূত্র: The Daily Star]

এই ঋণের সুদসহ সর্ম্পূণ অর্থ ১০ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যদি ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়, তাহলে নির্ধারিত গ্রেস পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশকে জরিমানা করা হবে, যা বাধ্যতামূলক পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে আসলসহ পরিশোধ করতে হবে।

IMF এর ঋণ

❑ IMF এর সহজ শর্ত

IMF এর সহজ শর্ত (soft condition)	IMF এর কঠিন শর্ত (Hard Condition)
• দুর্নীতি রোধ করা। • সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। • গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। • আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। • মানবাধিকার আইন মান্য করা ইত্যাদি।	• মুদ্রানীতি আধুনিক করা/ বিনিময় মূল্য বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়া। • রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার করা। • সামষ্টিক অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো সংস্কার করা। • বাজার উদারীকরণ করা/ বাজারে হস্তক্ষেপ না করা। • জ্বালানি খাত বেসরকারিকরণ করা। জ্বালানি খাতে সরকারি ভর্তুকি প্রদান বন্ধ করা।

❑ IMF এ ঋণ আবেদনের বাস্তবতা

২০২২ সালে IMF থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা কতটা বাস্তব সম্মত তা পরখ করার জন্য কিছু ঘটনার উপস্থাপন জরুরি–

- **করোনা মহামারি:** ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ সালে চীনের উহান থেকে শুরু হয় করোনা ভাইরাসের যাত্রা যা কয়েক মাসের মধ্যে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে আঘাত হানে ৮ মার্চ, ২০২০ সালে। করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি যেমন স্থবির হয়ে পড়ে তেমনি বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতিও কমতে থাকে। বাংলাদেশের GDP, GNI, মাথাপিছু আয় পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়। দারিদ্র্যের হার ১৫% এ নামিয়ে আনার কথা থাকলেও ২০২৪ পর্যন্ত তা ১৮.৭% এ স্থির রয়েছে, প্রবাসী আয়ও কমে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটা সংকট সৃষ্টি করেছে করোনা মহামারি।

- **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:** এ যুদ্ধের কারণে গত এক বছর যাবৎ বিশ্ব অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। বিশ্ব আমদানি রপ্তানির অন্যতম কেন্দ্র হলো রাশিয়া ও ইউক্রেন। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে রাশিয়া খাদ্যশস্য, সার, ভোজ্য তেল, গ্যাস ও জ্বালানি তেল রপ্তানি করতে পারছে না, ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশেও এ যুদ্ধের প্রভাব লক্ষণীয়।

IMF এর ঋণ

- **বাণিজ্য ঘাটতি:** আন্তর্জাতিক বাজারে সবকিছুর দাম বৃদ্ধিসহ পরিবহন খরচও বেড়েছে ব্যাপক হারে। তাই বাংলাদেশের আমদানিতে নাটকীয় উত্থান হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমদানি বৃদ্ধি আগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৯ শতাংশ। এ বছর এসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়ায় ১ হাজার ৭১৬ কোটি ডলার।
- **মূল্যস্ফীতি:** চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিতে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। ডলার সংকটের কারণে টাকার মূল্যের পতন ঘটছে ব্যাপক হারে। ২০২১ সালের জুন-জুলাইয়ের দিকে ১ ডলার সমান ৮৫-৮৬ টাকা ছিল কিন্তু বর্তমানে তা বেড়ে ১১৭ টাকাতে পৌঁছেছে। IMF বলছে বাংলাদেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতির হার ৮.৮ যা ২০২৩ সালে বেড়ে ৯.১% হতে পারে।
- **জ্বালানি সংকট:** বাংলাদেশ জ্বালানি আমদানিকারক দেশ। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সংকটের কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি আমদানিতে পড়েছে ভাটা, জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আর জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে প্রভাব পড়ছে কৃষি, শিল্প ও পরিবহন খাতে।
- **চলতি হিসাবের ঘাটতি:** বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলো– প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ। করোনা মহামারি ও যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী আয় কমেছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রবাসী আয় ছিল ২৪.৭৫ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে কমে হয় ২২.০৩ বিলিয়ন ডলার। এ কারণে বাংলাদেশের মোট আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে গেছে যার কারণে চলতি হিসাবে ঘাটতি বাড়ছে।

❑ করণীয়/সুপারিশ সমূহ

- ✓ IMF এর নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারিকরণ ও ঋণ পরিশোধ শিথিল (Loan repayment relaxation) করতে হবে।
- ✓ IMF ভর্তুকি কমানোর কথা বলছে। কিন্তু কোন কোন খাতে ভর্তুকি কমানো যেতে পারে তা রাষ্ট্রকেই নির্ধারণ করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করে ভর্তুকি কমাতে হবে।
- ✓ কাঠামোগত সমন্বয় করতে হবে। অর্থাৎ সরকারি ব্যয় হ্রাস, ভর্তুকি হ্রাস, করের হার পরিবর্তন ও পরিধি বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান লসে থাকলে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি।
- ✓ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি। প্রতিবছর দুইবার মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা। ডলারের মূল্য স্থির না ধরে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য নির্ধারণ করা।
- ✓ গৃহীত ঋণের অর্থ উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

❑ LDC থেকে উত্তরণ

১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে CDP তাদের ২০তম সভায় ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এর চূড়ান্ত ঘোষণা পেতে হলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পরপর ৩ ধাপে উত্তরণের শর্ত গুলো ধরে রাখতে হবে।

❑ LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত	CDP শর্ত	বাংলাদেশের অর্জন	
		২০১৮	২০২১
গড় মাথাপিছু আয় (GNI)	১২৩০ ডলারের বেশি (২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি)	১২৭৪ ডলার	১৮২৭ ডলার
মানব সম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৩.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৪.৮	২৫.২

[তথ্যসূত্র : United Nationas: Department of Economic and Social Affairs]

বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের প্রথমবার শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘের CDP ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করে যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) বিভাগ থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য ৩টি প্রয়োজনীয় শর্ত আবারো পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। একটি দেশকে LDC উত্তরণের জন্য পরপর ৩বার শর্ত পূরণের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশ ২০১৮, ২০২১ পরপর দুইবার সক্ষম হয়েছে। ২০২৪ সালে ৩য় বার সফল হতে হবে। যার ফলে ২০২৬ সালে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে এবং ২০২৭ সাল থেকে LDC ভুক্ত দেশের সকল সুবিধা বাংলাদেশ হারাবে।

❑ চ্যালেঞ্জ সমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

- GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।
- পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।
- LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।
- ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।
- বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।
- জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।
- স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

❑ LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

✓ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।

✓ সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।

✓ বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

❑ সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশসমূহ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

- ✓ আমাদের কর জিডিপি অনুপাত ৭.৫ শতাংশ যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কর সংগ্রহকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।
- ✓ মানি লন্ডারিং করে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মানি লন্ডারিং বন্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
- ✓ GSP সুবিধা হারানোর বিপরীতে FTA, PTA, MFN (Most favored Nation), GSP Plus সুবিধা ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ✓ FDI বাড়ানোর জন্য কূটনৈতিক মিশনগুলোকে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তুলে ধরতে হবে।

- ✓ যেহেতু বাংলাদেশ Copy right সুবিধা হারাবে সেহেতু Digital Economy, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- ✓ বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশগুলোকেও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।
- ✓ বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এ প্রবেশ করেছে যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে বাংলাদেশ তার জনশক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে।

❑ সাম্প্রতিক সমস্যা

১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। বাংলাদেশ তার ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের কারণে কোনো বৃহৎ বেসামরিক জোটে অন্তর্ভুক্ত হয় না বা অন্তর্ভুক্ত হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের জোট গঠনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যা বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলকে সংকটে ফেলেছে। নিম্নে কিছু ঘটনা তুলে ধরা হলো –

- বর্তমানে বাংলাদেশ চীনের উদ্যোগে গঠিত Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) এর সদস্য। একই রকম আরেকটি সংগঠন Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) যার উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে IPEF এ আমন্ত্রণ জানালে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন "RCEP এর মতো সংগঠনে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছে তাদের কেন IPEF এ যেতে হবে।"
- ২০১৫ সালে বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয় BIG-B (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt)। কিন্তু সম্প্রতি জাপান জানায় এই BIG-B Project চীন বিরোধী IPS এর অন্তর্ভুক্ত যা বাংলাদেশের জন্য খুবই হতাশাজনক।
- পদ্মাসেতু রেলওয়ে সংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও চীন এ প্রকল্পকে Belt and Road Initiative এর আওতাধীন বলে প্রচার করে যা বাংলাদেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- ভারত ও জাপান বাংলাদেশকে QUAD এ আমন্ত্রণ জানালে চীনা রাষ্ট্রদূত Li Jiming বলেন "বাংলাদেশের QUAD এর মতো ছোট একটি সংগঠনের সদস্য হওয়া উচিত নয়। এটি চীন ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে"।
- QUAD এর বিপরীতে চীন Trans-Himalayan Multi-Dimensional Network গঠন করছে এবং বাংলাদেশকে এই জোটে অন্তর্ভুক্ত করতে পরোক্ষ চাপ প্রদান করছে।

❑ সমস্যার প্রভাব

বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন ও ভারত থেকে আর সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মনোভাব বাংলাদেশকে দুই ভাবে প্রভাবিত করবে।

✓ কূটনৈতিকভাবে
✓ অর্থনৈতিকভাবে

➢ **কূটনৈতিক প্রভাব :** চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত মেরুতে চলার কারণে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকবার ভাবতে হচ্ছে যেমন: বাংলাদেশ QUAD কিংবা IPEF এ যোগদান করবে কী করবে না, যোগদান করলে চীন ব্যাপারটা কেমন ভাবে নিবে আবার যোগদান না করলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কীভাবে মূল্যায়ন করবে সেটা ভাবার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জোট দ্বন্দ্বের কারণে বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে কারণ এই দুই দেশকে এড়িয়ে কোনো দেশই তার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারে না।

➢ **অর্থনৈতিক প্রভাব:** যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ যদি পড়ে যায় আর দক্ষ কূটনীতির পরিচয় যদি বাংলাদেশ দিতে না পারে তাহলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে –

✓ চীন বিরাগভাজন হলে চীন থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হলে বাংলাদেশ বৃহত্তম রপ্তানি বাজার হারাবে।

✓ বাংলাদেশের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্পগুলো চীনের সহায়তায় করা হচ্ছে কোনো কারণে চীন যদি এগুলো স্থগিত করে দেয় তাহলে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। অন্যদিকে ২০২২ সালে বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের ২য় শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে যাওয়া মানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ডেকে আনা। তাই বাংলাদেশকে সতর্কতার সহিত এই দুই দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।

✓ বাংলাদেশ সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আমদানি করে চীন থেকে এবং পোশাক রপ্তানির অন্যতম বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। দুই দেশের বিরোধে বাংলাদেশ জড়িয়ে গেলে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি উভয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

❑ সমস্যা সমাধানে সুপারিশসমূহ

- বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় উদীয়মান শক্তি এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে ভারতের পর বাংলাদেশের অবস্থান। তাই বাংলাদেশ যেকোনো জোট বা যেকোনো পক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হতে পারে এ কথাটি বাংলাদেশকে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রকে বোঝাতে হবে।
- বাংলাদেশকে বোঝাতে হবে যে, বাংলাদেশের জন্য কোনো পক্ষই একক মিত্র নয়। বাংলাদেশের উন্নয়নে যারা অংশীদার তারা সবাই বাংলাদেশের বন্ধু।
- RCEP এর ১৫টি দেশের ৯টিই IPEF এর সদস্য তাই একই রকম সংগঠন হওয়ায় বাংলাদেশকে IPEF এ যোগদান না করলেও চলবে।
- বাংলাদেশকে বোঝাতে হবে যে তারা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন NAM এর সদস্য তাই সামরিক কোনো কর্মসূচিতে বাংলাদেশ যুক্ত থাকতে পারে না।

জোট দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশকে স্বেচ্ছায় কেউ সাহায্য করে না। হয় ব্যবসা করে না হয় ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে। তাই বাংলাদেশের জোট দ্বন্দ্ব নিয়ে চিন্তার কারণ নেই।
- পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. কে আব্দুল মোমেন বলেন "সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশ তার নিজ দেশের কল্যাণের জন্য নিজেই পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে"- এই নীতির বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
- "বাংলাদেশ যেকোনো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও অবকাঠামোগত সিদ্ধান্ত নিতে ভূরাজনৈতিক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে পারে" (সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম।)

- ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ কী হতে পারে? আঞ্চলিক রাজনীতিতে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেমন হলে সেটি বাংলাদেশের জন্য কৌশলগতভাবে লাভজনক হবে বলে মনে করেন? [৪৬তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ কীভাবে উপকৃত হতে পারে? সেক্ষেত্রে এ সকল দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি কীভাবে সাজানো প্রয়োজন? [৪৬তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- সাম্প্রতিককালে ভারতের আসাম রাজ্যে সরকারিভাবে তথাকথিত অবৈধ বাংলাদেশী খুঁজে বের করবার যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য একটি নীতিপত্র তৈরি করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কী কী করতে হবে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

- বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা পালন করতে পারে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক অঞ্চল বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীন। এই এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটি নীতিপত্র (Policy Brief) তৈরি করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- রোহিঙ্গা ইস্যুকে আপনি কী 'জাতীয় নিরাপত্তার সংকট' না 'মানবতার সংকট' হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনার বিবেচনায় এ সংকট মোকাবিলা করার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের বেশ কিছু অমীমাংসাকৃত সমস্যা রয়ে গেছে। এর মধ্যে একটি হলো সম্পদ (Assets) ও ধার দেনা (Liability) সংক্রান্ত। সম্প্রতি পাকিস্তান এই বিষয়ে কিছু মতামত প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এই সমস্যাটি নিরসনে কী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা আলোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

সমস্যাটি সমাধান করুন:

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু উন্নত দেশের বাজারে অগ্রাধিকার বাণিজ্য সুবিধা GSP পেয়ে থাকে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা স্থগিত করেছে। বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত GSP সুবিধা পুনর্বহালের চেষ্টা করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে GSP সুবিধা পুনর্বহাল সংক্রান্ত আলোচনায় কী কী বিষয় স্থান পাবে বলে মনে করেন এবং এসব বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরে, আলোচনা করুন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

Thank you

pdf

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

Policy Paper
On Young People and Poverty

ADOPTED AT THE GENERAL ASSEMBLY
KYIV, UKRAINE, 18-20 NOVEMBER 2010

Executive summary

Europe, despite its comparative economic power, is not immune to poverty. On the contrary, too many people remain without the sufficient means to be able to lead their lives in dignity. Moreover, the worryingly large percentage of young people among the poor is a yet more striking issue. This is one of the main challenges that Europe needs to tackle urgently, and with resolve.

In its Policy Paper on Young People and Poverty the European Youth Forum addresses youth poverty not only as a matter of resources but also as a matter of lack of opportunities. Poverty prevents young people from achieving their full potential and autonomy, adversely affecting their health, inhibiting their personal development, education and their general well-being.

This Policy Paper focuses on the poverty situation in Europe and on certain especially vulnerable periods of a young person's life, which are, in particular, proven to expose her/him to the risks of poverty and social exclusion. The European Youth Forum believes that this is linked to the peculiar transitional character of youth: the transition from childhood to adulthood, from education to the labour market, from living with the family to running a household on their own. There are several key stages of the transition phase when young people are potentially the most vulnerable: in education, in transition to work, at work and in family.

Therefore the European Youth Forum hereby suggests to tackle youth poverty and social exclusion more efficiently, by investing notably more efforts and policy responses into targeting this vulnerable transition phase to an autonomous adult life.

1. Introduction

The specific vulnerabilities that are experienced by young people and lead them into poverty are complex and originate from a wide range of factors. Distinguishing the causes from the effects is a difficult task. The European Youth Forum looks at poverty in its wider sense, taking into account not only its monetary aspects but also social exclusion. Youth poverty is, namely, not only a matter of resources but also a lack of opportunities. Young people can be subject to inequality of access to resources, rights and opportunities, which is often linked to multiple discrimination, in particular relating to socio-economic and family background, migrant background, sexual orientation, gender identity, ethnic origin, religion, belief or disability. This can prevent them from achieving their full potential, adversely affecting their health, inhibiting their professional and personal development, education and their general well-being.

Poverty is a problem of a global scale. In many cases, it prevents people from meeting their very basic needs, such as access to drinking water, food and shelter. Without diminishing the need to eradicate global poverty and its underlying causes, this Policy Paper mostly discusses the poverty situation in Europe, where extreme poverty, although still present in certain areas, is less prevalent. However, due also to the current economic and financial downturn, the number of Europe's young people in poverty is seriously increasing.

When addressing youth poverty in Europe, it would be unfair to depict this generation as the most exposed to the risks of poverty and social exclusion, especially compared to the levels of poverty among children and older people. However, the current generation of young people is much more vulnerable to poverty than previous generations were. Thus this policy paper focuses on certain especially vulnerable periods of a young person's life, which are, in particular, proven to expose her/him to the risks of poverty and social exclusion. The European Youth Forum believes that this is linked to the peculiar transitional character of youth: the transition from childhood to adulthood, from education to the labour market, from living with the family to running a household on their own.

Therefore, in order to tackle youth poverty and social exclusion more efficiently, notably more efforts and policy responses need to target this vulnerable transition phase to an autonomous adult life. Youth organisations themselves have always played a role in improving the lives of young people, through non-formal education, skills building in volunteering, keeping governments accountable, and inclusion through active citizenship. However, youth organisations and civil society in general cannot take the sole responsibility for tackling the problem. We need specific policies that are able to structurally tackle the problem, decreasing inequalities and promoting youth autonomy through employment and social inclusion policies.

In order to implement this, the European Youth Forum urges for strong political commitments on the local, national, European and global levels, as well as an effective coordination of policies in the areas of equality, non-discrimination, employment, social inclusion, migration and youth.

2. The scope of youth poverty

There are different ways of defining poverty and variations in how it is measured. It is important to be aware of these differences to better understand and be able to address it.

In Europe, poverty is usually defined using the one-dimensional and relative measure that takes into account the income situation of people.[1] According to EU statistics, 20 % of young Europeans aged 16–24 are poor, while the same poverty rate for the total population is 17%[2]. It is important to note that the rates tend to be higher for countries where young people actually start an independent adult life, while those who still live in their parent households and share their income are more likely to not be recorded as poor. Asked for the main reasons of living longer with their parents, 44% of young respondents indicated that they cannot afford to move out and 28% mentioned the lack of affordable housing.[3]

Poverty can also be depicted by multi-dimensional indexes that, besides income, also

---

1 The poverty rate in EU is measured using the at-risk-of-poverty rate which is a share of persons with income below at-risk-of-poverty threshold. At-risk-of-poverty threshold is a relative income level; persons with equivalised disposable income below that level are attributed to the poor. The most commonly used threshold in EU equals 60 per cent of the median equivalised disposable income. (EUROSTAT).

2 EUROSTAT (2007)

3 Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010, page 48-49

include other factors, such as poor health, lack of education, inadequate living standards, disempowerment, poor quality of work, threat of violence, energy poverty etc.[4] These elements are equally important for the well-being of young people, especially as poverty and social exclusion[5] are two intertwined phenomena that often manifest themselves together. Experiencing poverty, or being at risk of poverty, is intrinsically linked with the lack of financial means, exclusion and/or precariousness in the area of employment, and could also lead to exclusion in other areas of life. In this sense, the overall social exclusion encompasses monetary poverty as well as a wide range of disadvantageous situations and violations of fundamental rights leading to ill health, poor access to healthcare services, lack of affordable and decent housing, education, goods and services, sense of alienation from the society, lack of opportunities to participate into the public life and stigmatisation. The YFJ therefore demands a Europe-wide definition of poverty for young people, that includes a wider set of aspects.

Another crosscutting issue in this context is environmental sustainability, which is of the utmost importance for reducing poverty and for preserving economic and cultural wealth. This is especially on a global scale but also clearly affects Europe. More people are being displaced today due to environmental disasters (both natural and man-made) than by war. Young people, and especially girls and young women, are over-represented as victims of these disasters and are the most at risk of the extremely negative effects of climate change.[6]

In other parts of the world, especially developing countries, indicators of absolute poverty (or extreme poverty) are used to measure its scope. They are usually based on a fixed real poverty threshold and are defined by the basic needs and standards worldwide.[7]

The scope and level of poverty in developing countries is not comparable to regions like the European Union. Although everyone has their own benchmarks and challenges to meet, every person in the world should be able to have their basic human needs met and the frontrunners should not withhold their help. There are several measurable concrete actions that can be taken relating to poverty eradication on a global scope. An important step in reducing youth poverty will be that all the Millennium Development Goals will be reached before 2015, and they should be

---

[4] For more information: http://www.ophi.org.uk

[5] EC definition of social exclusion: " a process whereby certain individuals are pushed to the edge of society and prevented from participating fully by virtue of their poverty, or lack of basic competencies and lifelong learning opportunities, or as a result of discrimination. This distances them from job, income and education and training opportunities, as well as social and community networks and activities. They have little access to power and decision-making bodies and thus often feel powerless and unable to take control over the decisions that affect their day to day lives". Combating Poverty and Social Exclusion. A Statistical Portrait of the European Union 2010. European Commission.

[6] 0182-06 YFJ Policy Paper on Sustainable Development..

[7] One of the most widespread thresholds is the international poverty line, set by the World Bank and which was originally 1 US dollar (PPP – purchasing power parity) per day (*Proportion of population below $1 per day* is the percentage of the population living on less than $1.08 a day at 1993 international prices. The $1 a day poverty line is compared to consumption or income per person and includes consumption from own production and income in kind. Because this poverty line has fixed purchasing power across countries or areas, the $1 a day poverty line is often called an absolute poverty line. World Bank (1990)) revised in 2005 to 1,25 US dollar (PPP) per day; 2 US dollars (PPP) per day is also a measure that is often used.(Haughton, J., Khandker, S. (2009). Handbook on poverty and inequality. Chapter 3. World Bank.) Absolute poverty looks at whether the very minimum subsistence levels are assured to everyone. Today, there are almost three billion people in the world under the age of 25 and more than half a billion of them live on less than two US dollars a day. (World Youth Report (2007), UN).

connected to the World Program of Action for Youth. In order to achieve this, EU Member States must increase their financial contribution to development. It is essential that this co-operation is realised in an equal partnership for development, involving all the parties as stakeholders in the process. In this sense, poverty must also be considered relative to its social context. It is important to tackle poverty in the context of different social groups in different countries or specific regions within them. Investment in girls` and young women`s education, as an example, can strongly contribute to breaking the poverty cycle.Unsustainable practices in developed countries can become a root cause of a kind of poverty, which, although quite different from poverty in developing countries, is still poverty that needs to be dealt with.[8]

3. The life-cycle approach: transition to autonomous life and poverty

The fight against poverty should be all-encompassing in a way that nobody would be exposed to its risks. Addressing poverty at early stages can bring significant improvements to life chances later on, and can help people escape the vicious circle of exclusion. Nevertheless, with the demographic, economic and educational changes in European societies during the last decades, young people are becoming more and more vulnerable to risks of poverty. The life-cycle theory claims, inter alia, that the risk of experiencing poverty varies with age. At the beginning of the 20th century, the least vulnerable were young people in the age group 15 to 30, just after they had left their parent home and just before they had children themselves.[9]

Life-cycle patterns are different now due to the increased participation rates in higher education and the structural changes of the labour market; when trying to enter the labour market young people may spend considerable periods of time without a job, or in low-waged or insecure employment.[10]

A difficult transition phase to an autonomous adult life can be considered as one of the major causes of youth poverty. Research proves that young people are more likely to be poor if they have left their parents' home. Living in one's family of origin, or living as a couple but without children, has lower prevalence of poverty, whereas living alone, or as a lone parent, tends to increase this risk.[11] Once they are ready to start an independent adult life, young people should be in a position to do so without experiencing the financial difficulties that prevent them from their chosen life paths and family planning.

These challenges cannot be overcome without structural change. Solidarity from other parts of society and a better redistribution of resources within the tax and benefits systems need to be in place to counteract the negative effects of disproportionate risks of poverty at different ages. Intergenerational solidarity, responsibility and fairness should inevitably feature in the debates concerning poverty and social exclusion of the younger generations, at present and in the

---

[8] 0182-06 YFJ Policy Paper on Sustainable Development.

[9] Rowntree, S. (1901) *Poverty: the study of Town Life* London: Macmillan.

[10] Aassve, A., Iacovou, M. and Mencarini, L. (January 2005) 'Youth Poverty in Europe: what do we know?', Working Papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2005-2. Colchester: University of Essex.

[11] Aassve, A., Iacovou, M. and Mencarini, L. (January 2005) 'Youth Poverty in Europe: what do we know?', Working Papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2005-2. Colchester: University of Essex.

decades to come.[12]

There are several key stages of the transition phase when young people are potentially the most vulnerable:

3.1. In and out of education

In the field of education, a key need is to provide free access to education at all levels, in addition to grants to cover living costs, so that young people can become autonomous at an earlier age and to promote equal access to education for all.[13] Working towards this, scholarships and other types of financial support should be available to everyone, not depend on parental means-testing and should not force young people to take up side jobs or even full-time jobs in order to make ends meet. Young people should be given a possibility to lead a decent and autonomous young adult life during their study period. Scholarships and other types of support should also include sufficient support for extra costs, such as those of educational materials, accessible housing, costs connected to practical engagements as a part of a curriculum, or travel for people from rural areas. Furthermore, financial incentives for staying in elementary education could be provided to children or their families.[14]

High levels of early school leaving provide evidence of the failure of education systems to include all young people. Statistics show that nearly one out of six young people does not finish secondary education and early school and university leavers are highly susceptible to social exclusion and marginalisation.[15] Family background turns out to be a powerful indicator of early school leaving. Studies show that students of whom the parents are low educated or have a low socio-economic status are more likely to leave school early and that one of the consequences of this can be an unemployment rate that is twice as high.[16] What is more, the long-term social and financial costs of educational failure are high. Schools must be prepared to welcome and support all school students, regardless of their background. Early school-leavers should be given all support and incentives to re-enter free education, either in initial formal education or through lifelong learning schemes. Addressing the early school-leaving issue would improve the quality of life of the concerned individual, but also alleviate higher costs for health, income support, child welfare and security in society.

Phenomena that are not directly related to income poverty, such as discrimination and harassment experienced at school and a lack of youth friendly healthcare services, have a definite impact on the social exclusion of young people. Early school leavers are more likely to experience violence, discrimination and ill-health[17]. Discrimination experienced by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex young people at school have often had an extremely negative impact on their health and their fundamental right to education.[18] Discrimination and challenges experienced by young migrants in the field of education and employment are also alarming. Indeed,

---

[12] For more information see YFJ 0313-09 Position Paper on Solidarity Between Generations
[13] 0052-04 Policy Paper on Youth Autonomy
[14] 0052-08_FINAL_ Early_Education_Leaving
[15] 0813-07 Policy Paper on Youth Employment
[16] 0052-08_FINAL_ Early_Education_Leaving
[17] YFJ (2008). Annexes to the European Youth Forum Policy Paper on Early School Leavers. Brussels: European Youth Forum. EUROSTAT (2010). Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the European Union. Statistical book 2010. Figure 2.10
[18] Takacs, J. (2006). Social exclusion of young LGBT people in Europe.

the educational performances of young migrants are lower than those of their native peers[19], and the employment rate of migrants also averages at 3.3% lower than that of the general population.[20]

Although legal protection against discrimination exists to some extent, gaps within both European and national equality laws represent one of the major challenges to breaking the vicious circle of poverty and social exclusion.[21]

And, finally, education has to fulfill its primary tasks, of not only equipping young people for the labour market, but also of giving them skills for life. Citizenship education should be introduced in a comprehensive manner to promote active citizenship, and, with it, awareness of individual rights, and provide young people with the skills that enable them to make choices and take decisions and responsibility for their own lives.

3.2. When entering the labour market

Employment is often considered as one of the main tools for combating poverty and social exclusion. However, paradoxically, the current young generation, while being the best-educated generation ever, familiar with new technologies, more mobile and open to new opportunities, faces a higher degree of vulnerability in the labour market. The youth unemployment rate has been around twice as high as the rate for the total population throughout the last decade and currently, also due to the economic downturn, only in the European Union every fifth young person (15-24) is unemployed.[22] The phase of entering the labour market for young adults proves to be very difficult and can lead to insufficient and irregular earnings that subsequently prevent them from starting an autonomous adult life. A smooth transition from education to the labour market is a necessity for young people to live autonomous lives. However, in Europe, it is hindered by a number of factors, which include: insufficient qualifications, a "mismatch" of skills, a lack of generic skills, precarious working conditions, economic instability, a high level of competition for jobs and discrimination. This needs to be addressed, as such a situation prevents young people from receiving regular and sufficient income, and thus outsets them to poverty. Special attention needs to be paid in active inclusion labour market policies to disadvantaged groups of young people.

Specialised labour market support measures need to be created by public authorities and social partners. They must specially target young people and help the school-to-work transition phase become faster, quality-driven and leading to longer lasting work placements. No one can afford to waste the potential of young people by keeping them away from the labour market. Special measures, like youth guarantees, early intervention and back-to-work policies have to be in place to address the unprecedentedly high youth unemployment levels and to prevent further regress in

---

[19] Data Source OECD/PISA 2007

[20] Data Source EUROSTAT 2010

[21] EU non-discrimination law does not cover the grounds of age, sexual orientation, religion or belief and disability in any field but employment and occupation. It does not cover the ground of gender in the field of education. YFJ (2009). No to hierarchies of rights, YES to comprehensive protection against all forms of discrimination. Brussels: European Youth Forum http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=87&lang=en

[22] In July 2010 the unemployment rate (under-25s) was 19,6% in the euro area, and 20,2 in the EU27, with large disparities among Member States. For details see Eurostat, August 2010.

this area. The introduction of such measures has to be coupled with the relevant incentives, both for private and public employers, and with quality career guidance and training opportunities for young people as their counterpart. The European Social Fund should be further used and targeted for supporting such initiatives.

Internships and apprenticeships have become a reality for many young people, through which they complement their formal education and attempt to make the transition from education to work smoother. These work placements should provide quality and paid educational opportunities and should never be used as replacement for proper work by employers.[23] Young people are frequently exploited by organisations and companies who prefer to recruit highly skilled and low-paid young workers. Young people who seek to make the transition to the labour market are often caught in a cycle of exploitation and abuse of their working rights, in a precarious and underpaid labour market with no or little learning dimension. Besides, unpaid or extremely low-paid internships and similar work placements have a further impact on their life due to the lack of social security. To break the cycle, the defence and strengthening of the right to association is one key element to secure the working rights of young people.

3.3. At work

The level of in-work poverty among young people in the EU is 10%.[24] The working poor young people (i.e. those in employment but with a low income that keeps them in relative poverty) work for low salaries, with scarce social protection and in precarious working conditions. This does not allow them to lift themselves above the poverty threshold. Therefore, better targeted youth employment policies need to be introduced to overcome these conditions. Europe needs to commit themselves to the raising employment levels and support measures that promote integration in the labour market. These include implementing ambitious Life Long Learning strategies, revising the flexicurity schemes, recognising the competences acquired through both formal and non-formal education as well as through vocational training, encouraging employment from an earlier stage and promoting entrepreneurship and mobility as key factors in the employability of young people.

Youth is the group which suffers the most from precarious working conditions (40% young people have a temporary contract[25]), and the related security balance is clearly lagging behind. This dangerous trend needs to be reversed by accordingly adapting and modernising social security systems and ensuring that young people can have a stable and autonomous life, even with short term contracts or when unemployed. Besides, there needs to be specialised youth-targeted income support for situations where the labour market has failed and young people, due to their little or inexistent labour market experience, are not entitled to the standard support.

To secure certain minimum living standards across EU, especially with regards to decent work for young people, national minimum income schemes need to be introduced and better coordinated at the European Union level. The European Commission should play its role in encouraging Member States to agree on the

[23] YFJ Opinion Paper on Internships (0076-09)

[24] European Commission (2009). SEC (2009)549 final. Youth-Investing and empowering. EU Youth Report

[25] European Commission (2009). SEC (2009)549 final. Youth-Investing and empowering. EU Youth Report

development of more binding instruments whose impact can be assessed according to their effects on the different groups of young people they are attempting to support. A directive setting European guidelines on how to develop minimum income schemes would be an appropriate tool to fight the current trend towards negative competition between Member States as regards social policies, potentially leading to social dumping.[26]

Despite Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, discrimination on the ground of age still manifests itself. Young people should have for instance, equal access to social protection systems and their minimum wage/benefits should not be dependent on their age[27]. To this aim, key provisions included in the Revised European Social Charter and relating to the right to social security and decent working conditions, include fair remuneration, and should be fully implemented[28].

3.4. In family

There are young people who are outside the labour market and education structures for different reasons (e.g. care for family members and children), but they need support in order to not fall into the poverty trap. Social assistance schemes and other facilities should thus be put in place to support them throughout these periods. Higher risks of poverty for young couples, and especially young parents with children, might be detrimental to the exercise of their right to decide freely upon their private and family life. Young women are still responsible for greater proportion of child-care that neither contributes to their income nor to social protection. Furthermore, the European Youth Forum calls for affordable, qualtitative and flexible childcare facilities and support for young parents, especially lone parents, who should be able to successfully reconciliate their work and family life. Furthermore, precarious conditions experienced in the labour market, as well as high youth unemployment rates, compromise the possibility for young people to achieve a fair balance between their professional and private lives. In addition, the lack of access to affordable housing is a decisive factor in starting one's own family and moving away from one's parents' household to start an independent life. Similarly, high transport costs restrict young people's opportunities, particularly in rural areas.

4. The role of youth organisations in combating poverty and social exclusion

As reflected throughout the paper, addressing poverty is a complex task, linked to various policy fields. Poverty is a social phenomenon, of which the eradication can only happen through an ambitious agenda, based on a continuous dialogue between social partners and the relevant civil society organisations and leading to tailored and long-term actions. Youth organisations have for a long time played a fundamental role in advocating and concretely acting for overcoming poverty and supporting social inclusion themselves.[29]

---

[26] 0330-06 Position Paper on Active Inclusion)

[27] Recent ECJ case-law on discrimination on the ground of young age in the field of employment and occupation include: case C-229/08 Colin Wolf v. Stadt Frankfurt Am Main, case C-88/08 David Hütter v. Technische Universität Graz, case C-555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH&Co. KG,

[28] Council of Europe, Revised Social Charter (1997). Article 1-the right to work, article 2-the right to just conditions of work, article 4-the right to fair remuneration, article 12-the right to social security, article 13-the right to social and medical assistance, article 14-the right to benefit from social welfare services.

[29] Concrete examples of what Member Organisations of the European Youth Forum do to engage a wider

The European Youth Forum strongly believes that youth organisations should not only be involved in the implementation of policies, but also in their shaping, monitoring and evaluation as well as in data collection. Closer cooperation and partnership agreements are needed between various actors at all levels. While engaging in common actions, youth organisations, trade unions and employers' organisations, as well as higher education institutions, can indeed help to improve the transition from education to work and ensure decent work, notably through the establishment of efficient guidance mechanisms from an early stage, through the development of tools that enable the recognition of competencies gained through non-formal education, or through promoting youth entrepreneurship.

Unfortunately, it needs to be said that poverty and social exclusion affect active citizenship, hinder participation and set barriers for volunteering. Youth organisations, in their daily activities often, contribute to the activation and empowerment of young disadvantaged people that can eventually allow them to break away from the vicious circle of poverty. Among YFJ membership, there are organisations that pursue the involvement of vulnerable youth as their direct aim. Other youth NGOs create this added value indirectly: for example, training is a common feature of non-formal education provided by youth organisations. This, besides its direct aim, also supports promotion of human rights or work on social inclusion of disadvantaged youth, through youth work.

At the same time, there is still room for improvement: youth organisations need support in order to be able to increase their capacity to reach out to more young people living in poverty; they want to help remove the barriers to young people's participation in youth organisations' activities and help them to fight poverty and social exclusion.

5. Conclusion

Europe, despite its comparative economic power, is not immune to poverty. On the contrary, too many people remain without the sufficient means to be able to lead their lives in dignity. Moreover, the worryingly large percentage of young people among the poor is a yet more striking issue. This is one of the main challenges that Europe needs to tackle urgently, and with resolve. If we are to overcome the vicious circle of poverty and related phenomena, such as social exclusion and stigmatisation, investment in young people is urgent: in their education, in enabling their autonomy, in allowing them to enter and remain in the labour market and in quality jobs, and in ensuring that they can successfully combine their professional and private lives.

Poverty goes contrary to everything the European Youth Forum and its Member Organisations strive for. Youth organisations are ready and willing to contribute to its eradication – not only with bold statements but also with concrete work. But they cannot do it alone. Making poverty history will require the entire society to join the efforts. Let us do so, now.

range of young people, and to work for better social inclusion, are gathered in the Report on Youth NGOs reaching out to more young people and in particular, disadvantaged young people: http://youthforum.org/en/system/files/yfj_public/other_reports/en/reaching-youth.pdf

SLS

Tips for Writing Policy Papers

A Policy Lab Communications Workshop

This workshop teaches the basic strategies, mechanics, and structure of longer policy papers. Most policy papers are written in the form of a white paper, which offer authoritative perspective on or solutions to a problem. White papers are common not only to policy and politics, but also in business and technical fields. In commercial use, white papers are often used as a marketing or sales tool where the product is pitched as the "solution" to a perceived need within a particular market. In the world of policy, white papers guide decision makers with expert opinions, recommendations, and analytical research.

Policy papers may also take the form of a briefing paper, which typically provides a decision maker with an overview of an issue or problem, targeted analysis, and, often, actionable recommendations. Briefing books and white papers often accompany an oral briefing that targets key findings or recommendations. The decision maker then refers to the extended paper for the deep analysis that supports the core findings and/or recommendations.

Core Components:

Although the policy paper relies on your authority over the deep research that you have conducted on the issue or problem, you should also pay close attention to audience, the professional expectations and jargon of your targeted decision makers, and the structure and flow of your argument. Here are some general attributes that structure the analysis and argument for most policy papers:

- **Define the problem or issue.** Highlight the urgency and state significant findings for the problem based on the data. Objectivity is your priority, so resist the urge to overstate.
- **Analyze—do not merely present—the data.** Show how you arrived at the findings or recommendations through analysis of qualitative or quantitative data. Draw careful conclusions that make sense of the data and do not misrepresent it. Your data should be replicable.
- **Summarize your findings or state recommendations.** Provide specific recommendations or findings in response to specific problems and avoid generalizations.
- **Generate criteria for evaluating data.** Explain the key assumptions and methodology underlying your analysis and prioritize the criteria you rely on to assess evidence.
- **If you are producing recommendations, develop a theory of change, and analyze the options and tradeoffs according to your methodology and assess their feasibility.** What are the pros and cons? What is feasible? What are the predictable outcomes? Develop a logic model to gird your analysis and support your assertions with relevant data.
- **Address**—and when appropriate rebut—**counterarguments, caveats, alternative interpretations, and reservations to your findings or recommendations.** Your

credibility as a policy analyst relies on your ability to locate and account for counterargument. You should be especially sensitive to the likely counterarguments that a decision-maker would face in implementing or acting on your recommendations or findings.

- **Suggest next steps and the implications of the findings or recommendations.** You may briefly address the feasibility of next steps or explore the implications of your analysis.
- **Distill the conclusions succinctly in a concluding section and remind the decision-maker of the big picture, the overall goal, the necessity of the investigation, or of the urgency for action.** This answers the "Who cares?" question that reminds the reader of the value of the research and recommendations. If you are targeting a decision maker, you should reflect the decision-maker's primary concerns.

Heuristics to Assess Competing Policy Options:

The options feasibility charts and the PEST and SWOT matrices

After you have produced findings on the problem, you must orient the data around likely solutions. The option and decision feasibility chart and a PEST analysis can help you locate recommendations in competing data and perspectives.

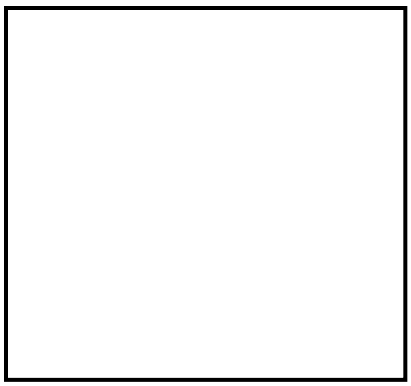

PEST focuses on how **political, economic, social, and technological** factors affect the feasibility of a policy option. Examples of political factors could include applicable regulations, taxation issues and government policies (which are also sometimes broken out more specifically as "Legal" factors); they can also be construed as the political interests at stake (which may overlap with social factors). Economic factors include inflation, business cycles, government spending, overall cost, and consumer confidence. Social factors include demographics, public attitudes, and income distribution. Technological factors focus on the technology involved in supporting or implementing a particular option, including energy use and the availability of key technology. PEST analysis involves not only identifying the relevant factors, but also considering options for responding to these influences.

Yet, PEST analysis for policy makers is a somewhat fluid heuristic. It simply offers a starting point from which you can drill down to increasingly detailed conclusions and recommendations. It may also be broken out as PASTEL, for example: Political, Administrative, Social, Technological, Economic, and Legal factors. You should adapt and prioritize the underlying criteria according to your policy needs.

The first example chart shows the variability in a strong PEST analysis, breaking it into five categories to assess the feasibility of implementing four recommendation options: Political Feasibility, Administrative Feasibility, Equity, Cost Effectiveness, and Environmental Impact.

That chart also shows that the policy writer folded Social Feasibility into the Political Feasibility and Equity tests. The example chart focuses on the problem of pesticides, offering four possible policy options to control farm pesticide use: (1) Do Nothing/Status Quo, (2) Tax Pesticides, (3) Increase Number of Pesticides Banned, (4) Discourage Pesticides through Tax Breaks to Ecologically Appropriate Crops, (5) Limit the Number of Pesticides that can be applied to a particular crop. The chart then assesses the overall positive and negative outcomes or qualities associated with each possible solution to reveal a dominant recommendation: Tax Pesticides.

You can build your own Feasibility Chart by measuring options in the context of PEST categories and through the perspectives of key interest groups. The more detailed your knowledge of your subject, the more authoritative the outcome of the chart. In this chart, the policy writer prioritizes five hypothetical solutions to the problem of pesticide use among farmers:

Options

Do Nothing/Status Quo	-	+	-	-	+/-
Tax Pesticides	+/-	+	+/-	+	+
Increase Number of Pesticides Banned	+/-	-	-	+	-
Discourage Pesticides through Tax Breaks to Ecologically Appropriate Crops	-	-	+/-	+	+/-
Limit the Number of Pesticides Used on Certain Crops	-	+/-	-	+/-	+/-
Criteria	Political Feasibility	Administrative Feasibility	Equity	Environmental Impact	Economic Impact/Cost Effectiveness

The PEST chart shows that, while all five options have positive environmental impact, only one of the options predominates among the other criteria. In this policy analyst's view, taxing pesticides meets the bar of being administratively feasible and equitable to all parties; it has a positive environmental impact and it is both cost effective and offers a positive economic impact. For this policy writer, taxing pesticides is the best recommendation, which she will highlight early in her memo.

You'll note, however, that the first column—"Political Feasibility"—shows up as the single negative for her recommendation of Tax Pesticides. Thus, in the body of her memo, the writer

needs briefly to address and rebut or qualify the shortcomings of the political feasibility of taxing pesticides. The writer will also discuss the highlights, tradeoffs, and shortcomings of the other findings, demonstrating, for example, the limitations of increasing the number of banned pesticides and of limiting the amount of pesticides applied to particular crops.

A second chart examines the same five possible options through the perspectives of involved interest groups.

Stakeholders Chart

Options

Do Nothing/Status Quo	-	+	+	-	-	-
Tax Pesticides	+	-	-	+	+	+
Increase Number of Pesticides Banned	+	-	-	+	-	+
Discourage Pesticides through Tax Breaks to Ecologically Appropriate Crops	+	+/-	-	+	+	+
Limit the Number of Pesticides Used on Certain Crops	+	-	-	+/-	+/-	+/-
Interest Groups	The Public	Traditional Farmers	Chemical Production Companies	Farm Labor	The Environment	Organic Farmers

The stakeholders chart shows that, while all five possible options (or solutions to the problem of under-regulated and over-used pesticides) have both positive and negative aspects, once again, the solution of taxing pesticides dominates. When the option of "Tax Pesticides" again shows up positively, the writer can feel certain in prioritizing that recommendation.

Should the researcher wish to drill down further into the recommendation of taxing pesticides, she could, for example, compose yet another chart that breaks "Tax Pesticides" into different components, depending on her overall goals. She might, for example, analyze different types of taxes for pesticides or, alternatively, break the pesticides into subgroups, taxing them according to their virulent effects on people or the environment. The chart is only as authoritative as its creator but it will focus your attention on possible outcomes or findings. It is a first step in clarifying your ideas before writing the policy paper.

SWOT (Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats) **Analysis**. The SWOT analysis is adapted from organizational management and business strategy. It surveys the surrounding environment of a specific policy or strategy that you are analyzing or proposing. It allows you to identify the internal characteristics of the policy as either strengths or weaknesses and classify external factors as opportunities or threats.

After assessing and classifying internal and external factors, analysts construct a 2-by-2 matrix with the following four cells: strengths-opportunities (S-O), weaknesses-opportunities (W-O), strengths-threats (S-T), and weaknesses-threats (W-T). You should run each of your recommendations through a SWOT analysis.

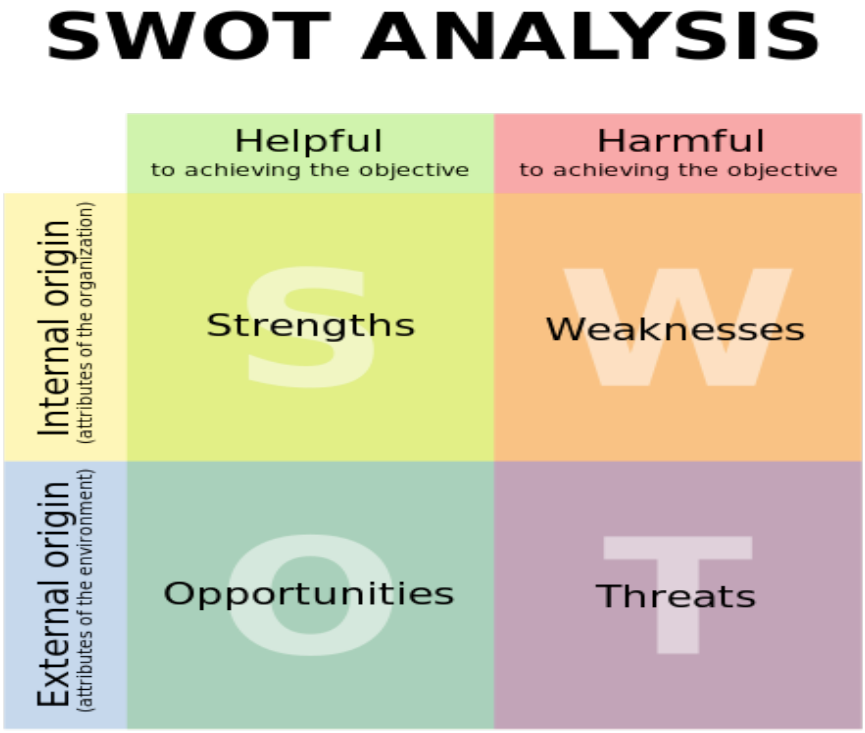

The Executive Summary

Once you have determined your dominant recommendation/s or findings, you are ready to structure your white paper or briefing book and write the Executive Summary. The structure of the paper or briefing book should build towards your recommendations, not develop the chronology of the problem or research. It can help to write a draft of the Executive Summary first as a structuring device. You will, of course, return to it at the end of the process of writing, revising it in accord with your final analysis.

Although the Executive Summary is the most important part of any policy paper, it is often the most difficult to write. Yet there are basic steps that will help turn complex ideas into succinct

and powerful arguments guaranteed to capture the attention of a busy reader. You will, for example, need briefly to describe the current policy situation, offer immediate pros and cons of your reasoning for change, and explicitly state your recommendation/s or findings.

The Executive Summary serves as a starting point – but also the end point – for the policy paper. It telegraphs your key recommendations, relying on your authority as a researcher or expert in your field. It not only summarizes your key points for the busy reader, but highlights the recommendations in a memorable way to guide future discussions. Think of it through the lens of your decision maker: What key points best prepare your decision maker to remember and understand your research and recommendations?

As a general rule, the executive summary is no more than 5% of the full length of the paper, so a 100-page white paper might have a 5-page executive summary. This is merely a rule of thumb. Your executive summary should be as long as it needs to be to summarize your key points.

1) **Motivation/problem statement:** Why do we care about the problem? What practical, theoretical, legal, sociological, or policy gap does your research address? How does your work contribute to the field? How does it intersect—or not—with other scholars' work in the field?
2) **Methods/procedure/approach:** What did you do to get your results? What methods did you use—e.g., developed and analyzed surveys, completed a series of multivariate regressions, analyzed the legislative history of the issue, interviewed stakeholders, etc.
3) **Results/findings/recommendations:** As a result of your analysis, what did you learn/recommend?
4) **Conclusions/implications:** What are the larger implications of your findings? How do they help readers understand the problem? How do they help decision makers understand/solve the problem? How do they help identify the gap in existing research? Are there next steps in pursuing research on the issue?

A useful way to draft your introduction is the journalist's "Who / What / Why / How" heuristic.

WHO and WHAT / Where

1. **Acknowledges** the target audience, the intended use/s, and the expected dissemination for the paper.
2. Concisely **states the problem or issue.** It may orient the problem in terms of policy. What are the limitations or deficiencies in current policy?

WHY

3. Offers **reasons** for initiating research to examine the problem and more fully explains why the issue is problematic.
4. May sign post **key policy options** or **standard approaches**; sometimes this is stated as the status quo, sometimes it includes existing alternatives that seek to remedy or address the problem.

5. May sign post the **pros and cons** of existing approaches or options or may highlight the **general trends** in addressing the issue.

HOW / When

6. May reference the **methodology** used to examine the data or explain core assumptions that guided research and analysis.
7. States **findings** or evidence that explore / describe / explain the issue. It may **recommend** corrective actions or policies.
8. Offers **supporting reasons** for the analysis of the evidence or for selecting or highlighting particular actions.
9. May **conclude** briefly with the urgency and opportunity for action.

A checklist for drafting the executive summary:

1. Are all of the crucial points of your argument covered? Do you prepare your reader for the analysis ahead? Conversely, if this is all the reader had to refresh her memory after reading your full analysis would she be adequately equipped to discuss your argument, testify on the issue, or move forward with a policy debate?
2. Is there a brief, clear storyline that outlines the big picture?
3. How effectively do you summarize the sections ahead? Does the structure of those sections reveal the right logic for your target audience? Have you framed the issues from the perspective of key stakeholders, senior decision-makers, or your target audience?
4. How focused is the background description? Beware of wasting space on background.
5. Are problems well specified from the perspective of the likely reader(s)? If relevant, are existing and potential laws, regulations, and current policy interventions covered?
6. If you are proposing policy options, do you signpost the tradeoffs involved? Are all problems matched with potential solutions or guidelines for change? Is the treatment of advantages and disadvantages (economically, politically) analytically sound and clearly explained?
7. Are recommendations and/or findings feasible, clear, and logically prioritized?
8. Do you suggest a framework for future work on the issue?
9. Is the overall presentation and writing quality up to professional standards? Do you avoid excessive wordiness?

Basic Structure of a Policy Paper

1. The **Executive Summary.**
2. **Introduction (and Background)**. These are sometimes broken out as separate sections with the introduction dedicated to the broad goals and underlying motivations for the paper and the background allowing a fuller development of the historical rationale and context for the

issue. Sometimes they are joined to describe the context for the ultimate goal, the decision to move forward with research on the topic, or the big picture for the research you are undertaking. This is also where you might highlight your theory of change.

3. **Methodology**. Narrate your methodology briefly. Relegate the micro data, survey questions, and the specific details for your rationale in the appendices.
4. **Literature Review**. Here, you should more fully describe the status of existing academic work or thinking about the issue and situate your own research in the context of questions that still need answers. How does your work or project fit into the overall context of existing research or common academic perceptions on the general issue? What scholarly contributions does your work offer?
5. **Policy Options or Policy Context.** Depending on the orientation of your research, you may need to explore the pros and cons of possible policy options. You should always describe the status quo of current policy, including current intervention efforts.
6. **Analysis of Findings or Evidence**. This is your original research. You want your argument to flow logically and fluidly, but be sure to use descriptive headings and subheadings to help guide and orient the reader.
7. **Case Studies and Best Practices**. If your findings are grounded in original case studies, indicate the names of those case studies individually with "Lessons Learned" at the end of each individual case study. Be aware that "Best Practices" demand rigorous analysis and do not flow intuitively from Lessons Learned. If your analysis of the case studies proves lengthy, you might relegate the full details to Annexes and then summarize each with "Lessons Learned" (and, if relevant, "Best Practices") in the text of the report.
8. **Policy Options and Recommendations**. Again, break these out by specific subheaders. Some policy papers may merge the findings and recommendations, with the recommendations flowing immediately from specific findings. Most, however, present all findings together in a single section, followed by policy options and recommendations. Just to be clear, it's okay if your analysis stops short of full recommendations so long as you clearly lay out the relevance for your analysis of the evidence.
9. **Implementation and Next Steps**. Some policy papers fold implementation into the recommendations or into next steps. Others break out this section discretely to detail the specific steps of how and when to implement the recommendations. If there are significant risks, costs, or obstacles associated with implementation, you should discuss them in the earlier section that describes the pros and cons of the policy recommendation/s. This section should be dedicated to the mechanics of implementation. Again, your paper may stop short of developing implementation, but you might acknowledge implementation as a part of "Next Steps."
10. **Conclusion**. Here, you might return to the big picture or the motive of your analysis: What is the goal of the analysis or of your policy recommendation/s? What will happen if the decision-maker does not act on your research or move forward with the recommendation? What will happen if she does? While you do not want to succumb to rhetoric, this is your opportunity to remind your reader of the importance of your analysis.
11. **Appendices**. These typically include the survey data and questions, charts and graphs, and details of case studies that gird your analysis.

12. **Bibliography**. While professional white papers may not reference their sources, any academic papers *must* provide a full bibliography in addition to fully cited, footnoted references. Footnotes and endnotes, however, are not standard for most white papers.

Sample White Papers

- For Copyright Policy Lab: United States Copyright Office, *PRE-1972 SOUND RECORDINGS* (12/11), Executive Summary. http://www.copyright.gov/docs/sound/pre-72-exec-summary.pdf
- Copyright Office, *PRE-1972 SOUND RECORDINGS* (12/11), Full Report.
    - http://www.copyright.gov/docs/sound/pre-72-report.pdf
- Prize-winning policy analysis thesis, Harvard Kennedy School: Mamie Marcus (2007), *Immigrant Voters in Massachusetts: Implications for Political Parties*,
    - http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/degree-programs/oca/pae-marcuss-immigrant-voters-in-massachusetts.pdf
    - This policy analysis paper first highlights the findings, building on them for the subsequent recommendations. It is far simpler in style, structure, and argument than a Copyright Office white paper, but it offers a good starting point for understanding the structure of a standard white paper.
- Prize-winning policy analysis thesis, Harvard Kennedy School: Agustina Schijman and Guadalupe Dorna, *From Vulnerable Mountaineers to Safe Climbers* (2012)
    - http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/degree-programs/mpaid/SYPA_Dorna_Schijman_2012.pdf
    - This policy paper offers trenchant insight on the decline of the middle class in Argentina, with actionable recommendations for the government. Following the Introduction, the paper defines its key terms and describes its methodology. It states clear motivations for the research, laid out as goals or objectives. At each step, the authors never lose sight of the practical and actionable nature of their research and recommendations.
- Pew Center, Asia Society. January 2009. "A Roadmap for U.S.-China Cooperation on Energy and Climate Change,"
    - http://www.pewclimate.org/US-China
    - This report presents a vision and a concrete roadmap for U.S.-China collaboration focused on reducing greenhouse gas emissions to mitigate the effects of climate change. The report begins with a "Forward" that highlights the importance of a collaboration between the U.S. and China as key leaders in negotiating climate change policy. The Forward also names key goals and describes underlying motivations.
    - The Executive Summary explicitly names basic assumptions for the rationale supporting the methodology, findings, and recommendations. Without those assumptions, readers will not be persuaded of the report's ultimate recommendations. The Executive Summary then advocates its major recommendations before moving on to explicit findings with second-level, more specific recommendations. The conclusion to the Executive Summary underscores the urgency of following its recommendations both in a negative sense—what will happen if China and the U.S. do *not* act on these recommendations—and in a positive sense—what will happen if China and the U.S. *do* act on the recommendations. While conclusions are not mandatory for executive summaries, they do allow you to return to the big picture or the motive and urgency of your policy recommendations.

SLS

Resources

General Texts on Policy Analysis:

- Bardach, Eugene. 2000. *A Practical Guide for Policy Analysis*. New York: Chatham House Publishers.
- Brest, Paul and Linda Hamilton Krieger, 2010. *Problem Solving, Decision Making, and Professional Judgment: A Guide for Lawyers and Policymakers*. Oxford UP.
- Smith, Catherine F. 2010. *Writing Public Policy.* Oxford UP.
- Weimer, David L. and Aidan R. Vining. 1992. Policy Analysis: Concepts and Practice. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Writing Guide:

- Williams, Joseph. 2008. *Style: Lessons in Clarity and Grace.*

Online Resources

- Harvard Kennedy School Communications Program
  - http://shorensteincenter.org/students/communications-program/
- The Hume Center for Writing and Speaking
  - https://undergrad.stanford.edu/tutoring-support/hume-center/writing/graduate-students/graduate-workshops
- *The HKS Policy Analysis Exercise: The Writing Guide*:
  - http://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/07/PAE-WRITING-GUIDE-2009.pdf
- "Advanced Policy Writing for Decision Makers," HKS communications course (DPI 821M), which focuses on the production habits, style, and structure for extended white papers and briefing books.
  - http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k92966
- "Policy Writing for Decision Makers," Luciana Herman's basic policy writing course (DPI 820M), which teaches basic policy analysis, style, and structure for proposals, memos, and oral briefings.
  - http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k91384